জানুয়ারি ৮৫

কিশোর বিস্ময়

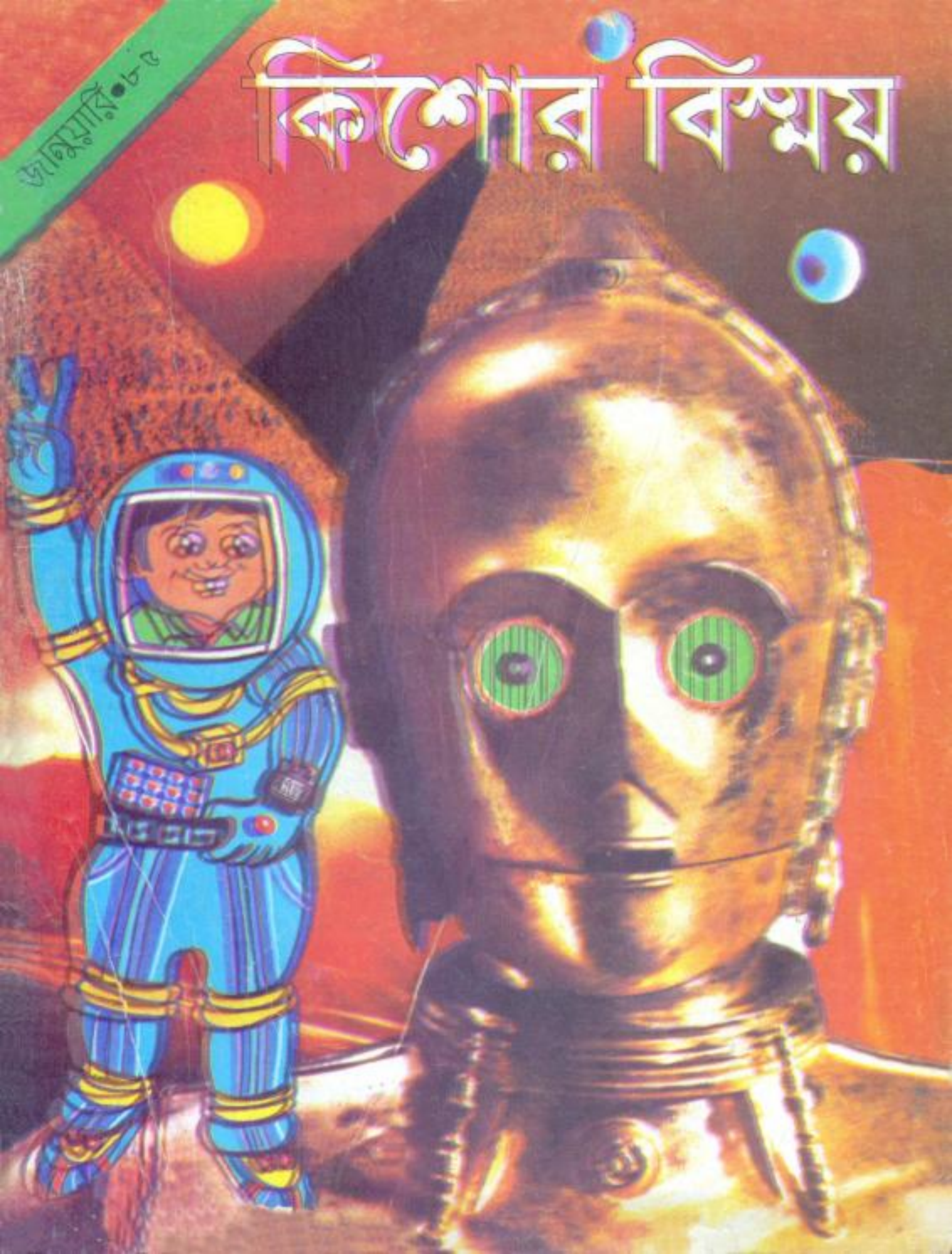

কিশোর বিস্ময়

নতুন গ্রাহক করা হচ্ছে

- প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩.০০ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ৩০ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। under certificate of posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- M. O. বা Bank Draft KISHORE Vismoi -এর নামে পাঠাতে হবে।
- পাঁচ বছরের জন্য গ্রাহক হলে ১২০ টাকা লাগবে। তার মানে চার বছরের গ্রাহক চাঁদা দিলে এক বছর বিনামূল্যে পত্রিকা পাবে।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যাপিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকাভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

কিশোর বিস্ময়

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা | ছোটদের জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্ময়কর পত্রিকা | জানুয়ারী ১৯৮৫

ধারাবাহিক উপন্যাস :

৪৭ সময় পর্যটক টারজন ◻ অদ্রীশ বর্ধন

বিজ্ঞান সুবাসিত গল্প :

১৯ নক্ষত্রলোকের মহাকাশযান ◻ প্রসাদ সেন

১৫ ভাইরাস ◻ অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

৫৩ বিল্টু পিল্কি ও ও বরফ ◻ সুতপন চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান ছড়া :

১০ বাঘ যদি বাগ মানে ◻ বীরেশ ঘটক

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা :

১১ আই কিউ কি ◻ পার্থ দত্ত

১২ দ্রুত লিখন পদ্ধতি ◻ পার্থ দত্ত

১৯ প্রথম আলো বাতি ◻ রীতা দত্ত

২০ শল্যচিকিৎসা কবে শুরু ◻ পার্থ দত্ত

ছবিতে কাহিনী ও সচিত্র বিস্ময় :

৮ আইনস্টাইন

৭ বিস্ময়ের নোট বই

বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান :

৬৪ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ◻ অতীন ঘোষ

বিশেষ ক্রোড়পত্র : কমপিউটার :
বৈদ্যনাথ রায়

২৮ কম্পিউটারের গোড়ার কথা

৩২ কম্পিউটার কি ভাবে কাজ করে

৩৬ কম্পিউটার কি কি কাজ করে

৪১ ক্রোড়পত্র কুইজ

বিজ্ঞান রচনা :

১৪ অংকারের বিস্ময় জোনাকি ◻ সুধাংশু পাত্র

৪৬ সাইবেরিয়ার পাখী ◻ মধুসূদন পাল

৬১ প্লাস্টিকের কথা ◻ দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

আজও রহস্য :

২১ রহস্য ঘেরা এল ডোরাডো ◻ ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

৬৭ বিজ্ঞানের ভেলকি ◻ অশোক রায়
মার্টিন গার্ডনার অবলম্বনে

নিয়মিত বিভাগ :

৫ বিজ্ঞান সংবাদ ◻ সব্যসাচী সেন

৫৯ ধাঁধা ◻ অজয় ঘোষ

৬ কিশোর জিজ্ঞাসা

সম্পাদক ◻ অনীশ দেব | নির্বাহী সম্পাদক ◻ অশোক রায়

প্রচ্ছদ ◻ কুমারঅজিত অলঙ্করণ ◻ সুশান্ত বিশ্বাস বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ ◻ রবীন মুখোপাধধ্যায়

অশোক কুমার রায় কর্তৃক ১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক অনুরাধা প্রেস ১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

আপনি কি ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী?
আপনার কি স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি ও মনের একাগ্রতা কমে যাচ্ছে?

* আপনি কি চিন্তা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন? আপনার ঘুম ঠিকমত হচ্ছে না?

তাহলে এখনই আপনার নিয়মিত প্রয়োজন

ব্রেনোলিয়া

স্মৃতিশক্তি ও স্বাস্থ্য সতেজ রাখার উৎকৃষ্ট টনিক

ব্রেনোলিয়া একটি উৎকৃষ্ট আয়ুর্বেদিক টনিক। যাহার পিছনে রহিয়াছে অর্ধ শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ভারতীয় বনৌষধির অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারের সেই সব সম্পদ– অর্থাৎ ব্রাহ্মী, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, যষ্টিমধু, আলকুশী ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগে তৈরী এই উৎকৃষ্ট টনিক। ব্রেনোলিয়া আপনার স্মৃতিশক্তি, চিন্তাশক্তি বাড়াইতে এবং শরীর সুস্থ ও সতেজ রাখিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

ব্রেনোলিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

১৩, মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা- ৩১
ফোন নং—৪১-০০৬৯

সংগ্রহে রাখবার মত ছোটদের বই

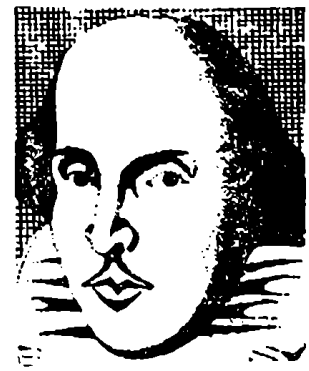

ছোটদের
শেক্সপীয়র কাহিনী

একগুচ্ছ কালোত্তীর্ণ গল্প
ছোটদের পছন্দসই অনুবাদ

লু শুন-এর
ছোটদের সেরা গল্প
১২

বিজ্ঞানী শতক
দেবব্রত রায়চৌধুরী

সুকুমার রায়
জানা অজানা ১০
ছড়ায় ছড়ায় সুকুমারের একগুচ্ছ বিজ্ঞানমনস্ক রচনা।

এ পি পি
১৬৬ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সব্যসাচী সেন

চিড়িয়াখানায় নকল প্রাণী

হিউসটন চিড়িয়াখানার একটি নকল রবারের সাপ সারা পৃথিবীর চিড়িয়াখানা-মহলে রীতিমতো হৈ-চৈ তুলেছে। কারণ চিড়িয়াখানার জনৈক দর্শক লক্ষ্য করেন যে একটি টেক্সান প্রবাল সাপ ন'মাসে একচুলও নড়েনি।

চিড়িয়ানার সহ-তত্ত্বাবধায়ক জন ম্যাকলেইন তখন ব্যাখ্যা করে বলেন, বন্দী অবস্থায় প্রবাল সাপকে বাঁচিয়ে রাখাই খুব কঠিন, বাচ্চা তোলা তো দূরের কথা। গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকটি প্রবাল সাপ মারা গেছে। সুতরাং নকল মডেল রাখা ছাড়া চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের আর কোন উপায় ছিলো না?

জনৈক সর্পবিদ চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বলেছেন, 'বুদ্ধিটা নেহাৎ মন্দ নয়।'

কিন্তু মার্কিন জিওলজিক্যাল পার্কস্ অ্যান্ড অ্যাকোয়ারিয়ামস সমিতির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ব্যাপারটা পছন্দ করেননি। তিনি বলেছেন, এ-নিয়ে হিউসটন চিড়িয়াখানার ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলবেন।

মহাকাশচারী হতে গেলে মোটা হোন

বহুদিন ধরেই ধারণা ছিল, মহাকাশচারী মানেই তাকে হতে হবে ছিপছিপে, শারীরিক কাজে পটু আর সবরকমে ট্রেনিং নেওয়া মানুষ। মহাকাশে ওড়ার ব্যাপারে মোটা মানুষদের কথা ভাবাই যেতো না।

কিন্তু দীর্ঘসময়ব্যাপী মহাকাশ অভিযানে মোটা মানুষদের দিকেই বর্তমানে পছন্দের পাল্লা ভারী। ইলিনয় কলেজ অফ মেডিসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যালফ নেলসনের মতে মার্কিন ও রাশিয়ান নভশ্চরেরা দীর্ঘসময়ের মহাকাশ অভিযানে দেহের চর্বি হারায়, কারণ মহাকাশে ক্ষিদে বেশ কমে যায়। মহাকাশে শরীরের ভর যদি সামান্য পরিমাণেও কমে যায় তাহলেও বেশ অসুবিধের কথা, বিশেষ করে সেই ভর যদি কমে হৃৎপিণ্ড জাতীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ থেকে।

নেলসনের বিশ্বাস, মহাকাশে স্থূলকায় নভশ্চরদের পাঠিয়ে যদি তাদের দিনে ১২০০ ক্যালরি পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা হয় তাহলে তাই যথেষ্ট। মহাকাশচারীদের খাদ্য চাহিদা যদি মোটামুটিভাবে দিনে ২২০০ ক্যালরি হয়, তাহলে বাকি ১০০০ ক্যালরি জোগান দেবে মোটা মহাকাশচারীর দেহের সঞ্চিত চর্বি।

রোগ নির্ণয়ে কমপিউটার

ডক্টর বিক্স হল একটি কমপিউটার। বুলগেরিয়ায় একদল হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের সহকারী হিসাবে যে দারুণ কাজ করছে। জরুরি অবস্থায় রোগীকে ক'ডোজ ওষুধ দিতে হবে ডক্টর বিক্স তাও বলে দেয়। এই কউপিউটারের ১২টি স্ক্রিন বা পর্দা রয়েছে, যাতে একজন রোগীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ৯৬টি তথ্য ফুটে ওঠে। এবং সেইসব তথ্য চিকিৎসকদের দ্রুত রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

কিশোর জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন :—গোলাকার চুম্বকের মেরু কোথায় থাকে ?

উত্তর :—গোলাকার চুম্বকের মেরু কেন্দ্রের দুই পাশে কোনো ব্যাস বরাবর খুব অল্প দূরে থাকে। ঐ চুম্বকের জন্য কোনো বহিঃস্থ বিন্দুতে প্রাবল্য নির্ণয় করার সময়, উহাকে দ্বিমেরু ধরে নেওয়া হয়।

প্রশ্ন :—পৃথিবীর ভরকেন্দ্রের অবস্থান কিরূপে নির্ণয় করা যায় ?

উত্তর :—নীতিগত ভাবে পৃথিবার ভরকেন্দ্রের অবস্থান নির্ণয় করা শক্ত নয়। দুটি বিভিন্ন স্থানের উলম্বরেখা যেখানে পরস্পরকে ছেদ করে সেই বিন্দুই পৃথিবীর ভর কেন্দ্র হওয়া উচিত, অবশ্য এই ভাবে নির্ণয় ভর কেন্দ্রের অবস্থান সঠিক হতে পারে যদি পৃথিবী সম্পূর্ণ ভাবে গোলাকার ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার নয়, তাছাড়া অসমান উপরিতলের জন্যও উলম্বরেখা সঠিক ভরকেন্দ্রের দিক নির্দেশ করে না। পৃথিবীর উপরিতল থেকে বেশ কিছু ওপরে যদি উলম্বরেখা গুলি নেওয়া হয়, তাহলে ভরকেন্দ্রের স্থান নির্দেশ সম্ভব।

প্রশ্ন :—একবার কোথায় যেন বারমুডা সম্বন্ধে পড়েছিলাম, সেই থেকে ব্যাপারটা আমায় আশ্চর্য করছে।
বারমুডা ট্র্যাঙ্গালটা কোথায় অবস্থিত ? এবং এটিকে কি কারণে ভয়ংকর বলা হয় ?

উত্তর :—আগামী কোন সংখ্যায় 'আজও রহস্য' বিভাগে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করা হবে।

প্রশ্ন : একটি ধাতব তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়ে সেটিকে উত্তপ্ত করা হলো। তারটির অর্ধেক ঠাণ্ডা জলে ঢুকিয়ে দিলে বাকি অর্ধেক আরো বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কেন ?

উত্তর : তড়িৎবাহী ধাতব তারের অর্ধেক ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে দিলে ঐ অংশের বৈদ্যুতিক রোধ বাকি অংশের রোধের চেয়ে কম হয়। ফলে ঐ অংশের দুই প্রান্তের বিভব-বৈষম্য হ্রাস পায় এবং বাকি অর্ধেকের দুই প্রান্তের বিভব-বৈষম্য বাড়ে। বিভব-বৈষম্য বৃদ্ধির ফলে তারের বাকি অর্ধেকে তাপ-উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন : বৈদ্যুতিক হিটারের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে হিটারের তারে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তাপ উৎপন্ন হয়, কিন্তু এর উষ্ণতা কিছুক্ষণ পরই স্থির হয়ে যায়। এর কারণ কী ?

উত্তর : হিটার তারের উষ্ণতা যতো বাড়তে থাকে বিকিরণ, পরিবহণ এবং পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ-ক্ষয়ের হার ততো বাড়তে থাকে। এক সময় তড়িৎপ্রবাহের ফলে তাপ-উৎপাদনের হার তাপক্ষয়ের হারের সমান হয়। এরপর হিটারের তাপক তারের উষ্ণতা আর বাড়ে না।

প্রশ্ন : একটি স্থায়ী দণ্ড চুম্বক একটি ধাতব অংশটার মধ্য দিয়ে নীচে পড়ছে। চুম্বকটি কি অবাধে পতনশীল বস্তুর ধরণ নিয়ে নামবে ?

উত্তর : চুম্বকটি যখন ধাতব অংশটির মধ্য দিয়ে পড়তে থাকে তখন অংশটির তড়িৎপ্রবাহ আবিষ্ট হয়। লেঞ্জের সূত্রানুসারে এই আবিষ্ট প্রবাহ চুম্বকটির পতনকে বাধা দেয়। ফলে চুম্বকটির নিমজ্জনে ধারণ অভিকর্ষণ ত্বরণের চেয়ে কম হবে

বিস্ময়ের নোটবই

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাকড়সার নাম 'খেরাপোসা ব্লোন্ডি।' এর এক একটি পায়ের দৈর্ঘ্য ১০ ইঞ্চি। এদের বলা হয় রাক্ষস মাকড়সা, এরা পোকামাকড় তো বটে পাখীও খায়। দক্ষিণ আমেরিকার ঘন জঙ্গলে এদের বাস। দিনের বেলায় চুপচাপ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে পাথরের ফাঁকে বা পাতার ঝোপে। রাতের বেলায় শিকার ধরতে বেরোয়। 'দানবাকৃতি'র জন্য সহজেই এরা পাখী ও সরীসৃপ শিকার করতে পারে।

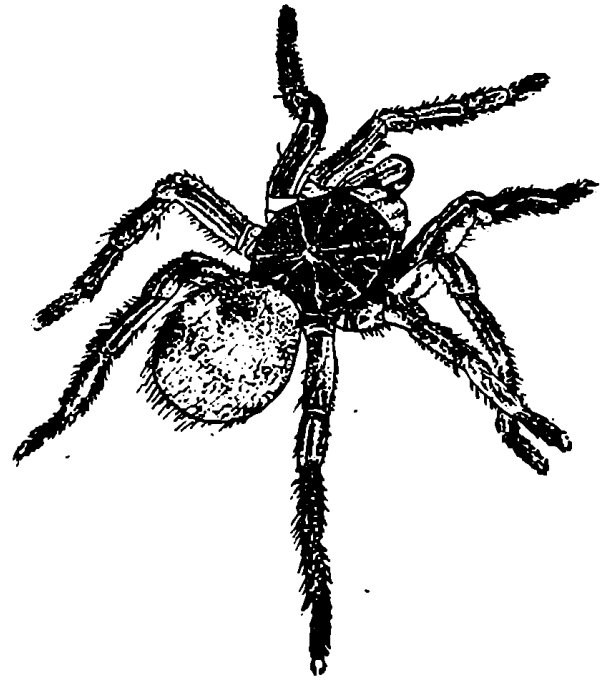

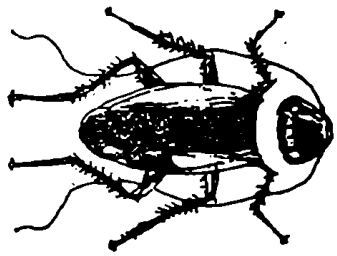

একটা আরশোলার মাথা যদি ধর থেকে সযত্নে কেটে ফেলো দেখবে এর মৃত্যুও হবে না বা রক্ত বেরোবে না। বরং কয়েক সপ্তাহ বেচেই থাকবে। কিন্তু এভাবে চললে, খাদ্য গ্রহণ করতে না পেরে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বে।

যে সব জন্তুরা লাফিয়ে চলে অথচ মাথায় শিঙ বা বড় শিঙা আছে তারা এই শিঙ ব্যবহার করে আত্মরক্ষার জন্য বা মেয়ে জন্তুকে অধিকার করার জন্য। এদের গায়ে অসম্ভব শক্তি থাকা সত্বেও এরা মাংশাসী নয় নিরামিশাষী।

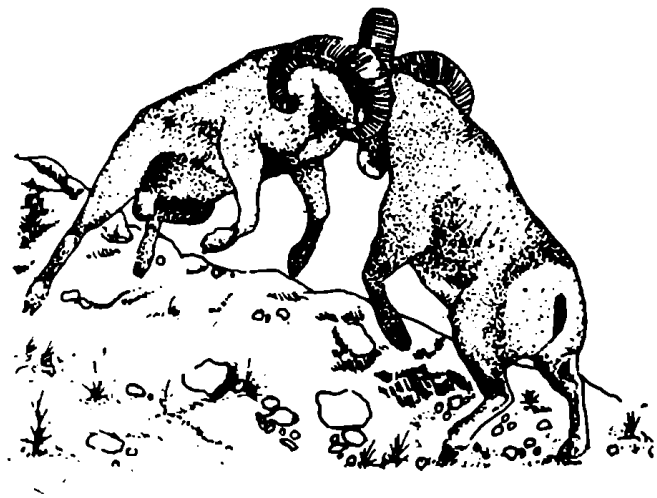

আলবার্ট আইনস্টাইন

কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আলবার্টকে বিব্রত করতে লাগল।

তা সত্ত্বেও আলবার্টের কাজ ঠিকমতো চলতে লাগল। ইউরোপের বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অনেক কলেজ থেকেই তাঁকে আমন্ত্রন জানানো হল বক্তৃতা দেবার জন্য। কয়েকটা জায়গা থেকে চাকুরীর প্রস্তাবও এল।

একদিন জার্মানী থেকে লোকজন এলো তার সঙ্গে দেখা করতে।
আমরা চাই আপনি জার্মানীতে আসুন, সেখানে কাজ করুন।
নতুন একটি পদার্থ বিদ্যা সংক্রান্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব দেয়া হবে। আপনার আয়ও হবে প্রচুর।
আপনি পড়াতে পারেন, কিংবা সারাটা সময় পড়াশুনা করে কাটাতে পারেন।
প্রস্তাবটা খুব ভালো। আমি যেতে পারি, যদি সুইজারল্যান্ডের নাগরিক হিসেবে আমাকে মেনে নেয়া হয়।
জার্মানরা রাজী হল। ১৯১৪ সালের এপ্রিলে আইনস্টাইনরা বার্লিনে চলে এল। কিন্তু খুব শীঘ্র স্বামী স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবং মিলেভা ছেলেদের নিয়ে ফিরে গেল জুরিখে।
আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব একই রকম থাকবে।
আর যদি কখনও নোবেল পুরস্কার পাই, তাহলে তার টাকাটা তোমাকে দিয়ে দেব।
আলবার্ট এসে দেখলেন বার্লিন জার্মান সৈন্যে ছেয়ে গেছে।
এতো বড় সৈন্যবাহিনী! নির্ঘাত যুদ্ধ বাঁধবে।

বীরেশ ঘটক

বাঘ যদি বাগ মানে

সুন্দরবনে থাকে দক্ষিণরায়
বাগে পেলে মানুষের ঘাড় মটকায়।
মাছ ধ'রে মধু এনে কাঠ কেটে যারা
জীবনযাপন করে, তটস্থ তারা।
প্রতিদিনই তাদের তো বনে যেতে হয়
কখন হামলে পড়ে—মনে এই ভয়।

বাঘ যদি বাগ মানে হত মজাদার
ভাবলো সে-কথাটাই ফিল্ড অফিসার
অনেক ঘামিয়ে মাথা নিল প্ল্যান ছকে
হামলে পড়লে বাঘ যেতে পারে ঠকে।

এবার প্ল্যানটা শোনো, মাটি দিয়ে গড়ে
নকল মানুষ কিছু দিল খাড়া করে।
কেউবা কুঠার হাতে যেন কাটে গাছ
নৌকোয় বসে কেউ ধরে বুঝি মাছ।

যেই বাঘ ঝাঁপ দিল লোকটার গায়
শক খেয়ে অমনি সে দূরে ছিটকায়
নকল লোকের দেহে বহে বিদ্যুৎ
হলেও নকল তাতে ছিল না যে খুঁত।

আই কিউ কি ?

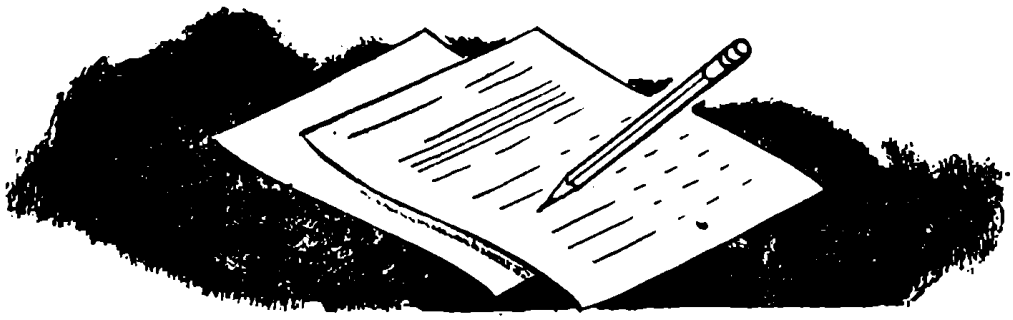

একজন মানুষের মানসিক এবং শারীরিক বৃদ্ধি সাধারণতঃ মানানসই হয়ে থাকে। এই দু'ধরণের বৃদ্ধিলাভ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন বয়সে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যেমন ধরা যাক এক ব্যক্তির ষোল বছর বয়সে পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা, এবং পরে সে এর বেশি লম্বা আর কখনো হতে পারে না। কিন্তু তার ভাই আরো বেশি লম্বা হতে পারে এবং দেখা গেল ১৯ বছর বয়সে তার উচ্চতা ছয় ফুটে দাঁড়িয়েছে। মানসিক বৃদ্ধির ইতি করে অধিকাংশ মানুষের ১৩ থেকে উনিশ বছরের মধ্যে।

১০ই অক্টোবর, ১৯৪৭ সালে জন্মেছে এমন প্রতিটি ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা করে তুমি দেখতে পাবে, দৈহিক বৃদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রকমের। কেউ লম্বা, কারো বা উচ্চতা গড়পড়তা, আবার কেউ বা বেঁটে। এমন কি মানসিক প্রসারতা একের অপরের থেকে বিশেষ তারতম্য লক্ষণীয়। কেউ দারুণ মেধাবী খুব সহজেই নতুন নতুন জিনিষ শিখে ফেলতে পারে। মনের প্রসারতায় এই যে তারতম্য এর কারণ কি জান? মানুষের মনেরও একটা ধর্ম আছে, আছে বয়স, তাই তফাতটা এখানেই।

আমরা মানুষের উচ্চতা কত তার মাপ নিতে পারি, কিন্তু তাদের মানসিক অগ্রগতির হিসেব আমরা কি করে করব, সেটা জানতে হবে। এর জন্য ধারাবাহিক ভাবে মানসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয়। তার কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক এখানেঃ প্রথমে আমাদের দেখতে হবে, বিভিন্ন বয়সের শিশুরা কি কি সমস্যার সমাধান করতে পারে। ছ'বছরের বাচ্ছারা, এক ধরণের সমস্যার সমাধান করতে পারে, আবার আট বছর বয়সের ছেলেরা আর একটা কঠিন সমস্যার সমাধান করতে অভ্যস্ত।

এখন ধরা যাক ছ'বছর বয়সের বিভিন্ন শিশুদের ওপর আমরা পরীক্ষা চালালাম। দেখা গেল তারা যা পারে চার এবং পাঁচ বছরের শিশুরাও তা পারে। অপরপক্ষে দেখা গেল আট কি দশ বছরের ছেলের সেই সব সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে কার কত বুদ্ধি সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি। যদি ছ'বছরের ছেলে কেবল ছ'বছর বয়সের উপযুক্ত উত্তীর্ণ হয়, তার মেধা তখন গড়পড়তা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। আবার যদি দেখা যায়, চার কিংবা পাঁচ বছরের ছেলে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তখন সে অধিকতর ভাল। দশ বছর বয়সের ছেলে যদি ছ'বছর বয়সের ছেলের পরীক্ষায়ও যদি উত্তীর্ণ হতে না পারে তখন তার মেধা নিম্নমানের বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

ইংরিজীতে 'আই, কিউ' এই দুটি অক্ষর হল দুটি শব্দের সংক্ষিপ্তকরণ, অর্থাৎ বুদ্ধির ভাগফল আর কি।' গণিত সংক্রান্ত নিয়মে এইসব পরীক্ষার ফলাফল বর্ণনা করার উপায়টা কি রকম। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ছবছরের একটি ছেলের মানসিক বয়স যদি ছয় হয়, তার 'আই, কিউ' হবে ১০০। মানসিক বয়সকে কালক্রমানুসারী বয়স (বছর দিয়ে বয়স) দিয়ে ভাগ করা হয় এবং তারপর ১০০ দিয়ে গুণ। এই হল 'আই, কিউ'-এর ফলাফল পাওয়ার পথ। যদি দেখা যায় পাঁচ বছরের ছেলের মানসিক বয়স ছয়, সেক্ষেত্রে তার 'আই, কিউ' হবে ১২০ (ছয়কে পাঁচ দিয়ে ভাগ, তারপর ১০০ দিয়ে গুণ)। ৯০ থেকে ১০০ 'আই কিউ' হলে তার মেধা গড়পড়তা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে এবং ১১০ এর বেশি হলে বেশি মেধাবী হিসেবে তাকে গণ্য করা হয়।

□ পার্থ দত্ত

দ্রুত লিখন পদ্ধতির আবিস্কার কে করেন ?

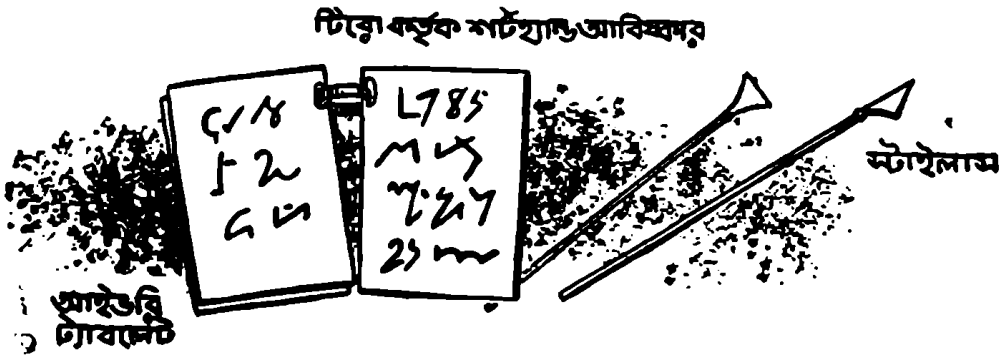

কথা বলার মতো দ্রুত গতিতে তুমি কি লিখতে পার ? প্রায় কেউই তা পারে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ মানুষের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের বাণী লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজন হয়। সেটা একমাত্র সম্ভব দ্রুত লিখন পদ্ধতিতে। দ্রুত লিখন পদ্ধতি অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'শর্টহ্যান্ড।' তা হল কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্নের সমন্বয়, যা দ্রুত লেখা যায়। এইসব সাংকেতিক চিহ্নগুলো, পরে যারা এই পদ্ধতি জানে অনায়াসে পড়তে পারে। আজকাল এই শর্ট হ্যান্ডের আরো একটি নামকরণ করা হয়েছে, স্টেনোগ্রাফি (যার অর্থ হল সংক্ষেপে লিখন)।

তোমরা হয়ত ভাববে, এই দ্রুতলিখন পদ্ধতি হালে আবিস্কৃত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতি ২,০০০ বছরের পুরনো। পুরাকালে রোমানদের সময়ে সিসেরো এবং সেনেকা শাসক সভায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন। টিরো নামে এক ব্যক্তি খৃষ্টপূর্ব ৬৩ অব্দে সেইসব বক্তৃতা লিখে রাখার জন্য শর্টহ্যান্ডের পদ্ধতি আবিস্কার করেন। তার সেই পদ্ধতি এতই ভাল যে, রোমান স্কুলে সেই পদ্ধতি শেখান হত। রোমান সম্রাটরাও এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করেন এবং এর ব্যবহার পরবর্তীকালে একশো বছর ধরে চলে। এই পদ্ধতির মূল ভিত ছিল যে কোন কথা সংক্ষিপ্তকরণ করে সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা লিখে রাখা। এই পদ্ধতিতে ব্যঞ্জনবর্ণের চিহ্নও লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা আছে লাইনের উপরবর্তী, মধ্যবর্তী এবং নিম্নবর্তী অংশে।

তবে রাণী এলিজাবেথের সময় আধুনিক শর্টহ্যান্ডের জন্ম হয় ইংলন্ডে। প্রতিটি চিহ্ন চারটি বিভিন্ন দিকে তির্যক ভাবে হেলান দিয়ে শব্দের দ্রুত লিখনের পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়, এবং প্রতিটি চিহ্নের ভিত্তি বারোটি বিভিন্ন উপায়ে তৈরি করা যায়। ১৮৩৭ সালে আইজ্যাক পিটম্যান শর্টহ্যান্ডের নতুন একটা পদধতি আবিস্কার করেন, শব্দের উপরে ভিত্তি করে দ্রুত লিখনের সেই পদ্ধতিতে সব শব্দ যেমন ভাবে উচ্চারিত হবে ঠিক সেই ভাবেই সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে, বানান করে লেখা নয়। চল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের শব্দের জন্য ছাব্বিশটি চিহ্ন আছে ; বিন্দু এবং যতিচিহ্ন (—) স্বরবর্ণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১৮৮৮ সালে গ্রেগ শর্টহ্যান্ডের উন্নত ধরণের একটা পদ্ধতি প্রচলন করেন, এবং এই পদ্ধতি আজকাল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র।

□ পার্থ দত্ত

সুধাংশু পাত্র

অন্ধকারের বিস্ময় জোনাকির আলো

অন্ধকারের একটা রোমাঞ্চ আছে। দিনের আলোয় বস্তুমাত্রকেই আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই, আঁধারের আড়ালে আত্মগোপনকারী বৃক্ষলতা, পশুপাখী প্রভৃতি সবাইকে যেন কোন এক কল্পলোকের বাসিন্দা বলে মনে হয়। তার উপর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের বুক চিরে কোথাও কোন ক্ষীণ আলোর দীপ্তি যদি প্রকাশ পায় তাহলে তো কথাই নেই। যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে পুলকিত হতে হয়।

অন্ধকারে মনুষ্যসৃষ্ট আলোক অবশ্য ততখানি শিহরণ জাগায় না, যতখানি জায়গায় আমাদের চারপাশে জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গদের দেহনিঃসৃত আলো। প্রকৃতির যেন এক একটি বিস্ময় এরা। দিনের আলোয় ওদের দেখলে কিছুটি মনে হয় না। কিন্তু অন্ধকার ঘনীভূত হলে মুখে নীল আলো জেবলে যখন খেঁকশিয়ালরা ছুটাছুটি করে তখন মনে হয় দলে দলে অশরীরী মাঠঘাট, বন-বাদাড় যেন চষে বেড়াচ্ছে। ঘরের ছাদে অথবা গাছের ডালে অন্ধকারে বেড়াল, বনবেড়াল প্রভৃতিরা যখন চুপটি করে বসে থাকে তখন তাদের চোখ দুটি থেকে নির্গত তীব্র আলো দর্শকের মনে ভীতির সঞ্চার করে। কোন কোন সাপ ও বিছেকেও রাতে নীলাভ আলো ছড়াতে দেখা যায়। আর কিছু কিছু সমুদ্রের মাছও। সাগর বেলায় এক ধরণের অতি ক্ষুদ্র জীবকে অন্ধকারে নীল আলোর বিন্দুর মত দেখায়।

জীব জগতের অনেকের দেহ থেকে আলো নিঃসৃত হলেও একমাত্র জোনাকিদের আলো ছাড়া অপরদের তেমন একটা চোখে পড়ে না। অন্ধকার নেমে এলেই গাছের মগডালে এবং ঝোপে ঝাড়ে দপ দপ করতে থাকে অসংখ্য নীল আলোর ফুলকি। যেন হীরে মাণিক্যের মালা পরে আছে গাছপালা।

এই জোনাকিরা একধরণের কীট ছাড়া অন্য কিছুনয়। কীটদের মধ্যে একমাত্র জোনাকির আলো আমরা দেখতে অভ্যস্ত হলেও এই ধরণের আরও বহু কীট আছে পৃথিবীতে। আজ পর্যন্ত প্রায় হাজার খানেক অনুরূপ কীটের সন্ধান পেয়েছেন বিশেজ্ঞরা। এদের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় যে দ্যুতিসম্পন্ন কীটদের দেখা যায়, তারা আরও অদ্ভুত। জোনাকিদের কেবলমাত্র পেটের তলায় নীলদ্যুতি দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার ঐ সব কীটদের দেহের দু'দিকে থাকে দু'সারি নীল আলোর বিন্দু এবং সামনে গাড়ির হেড লাইটের মত লাল আভাযুক্ত আলো। তাই ওদের বলা হয় রেলওয়ে বিট্‌ল।

এই সমস্ত কীটদের জীব বিজ্ঞানীরা বিশেষ এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পরিবারটির নামকরণ করেছেন ল্যামপিরিডি ফ্যামিলি। ল্যামপিরিডি অর্থে দ্যুতিসম্পন্ন বোঝায়। অর্থাৎ এই পরিবারে যারাই অন্তর্ভুক্ত তারা সবাই অন্ধকারে আলোর দ্যুতি ছড়ায়। জোনাকিসহ প্রায় হাজার প্রজাতির কীট আছে উক্ত পরিবারে।

এখন প্রশ্ন, ঐ কীটদের দেহ থেকে নীলাভ আলো নিঃসরণের কারণ কি? কেন খেঁকশিয়ালের মুখে নীল আলোক জ্বলতে দেখা যায়? কেন সাগরজলের কিছু কিছু মাছ, সাগরবেলার জলের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব, বিছে, সাপ প্রভৃতিরা নীল আলোর রশ্মি ছড়ায়?

এই আলো নির্গত হওয়ার মূলে আছে লুসিফেরিণ নামক এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ। জোনাকিদের কথাই

ধরা যাক। ওদের দেহে যেমন লুসিফেরিণ থাকে তেমনই থাকে লুসিফেরাস নামে একটি উৎসেচক বা একজাইম। উৎসেচকটি অবশ্য তাদের দেহে আপনা হতে তৈরি হয়। যখনই লুসিফেরিন বাহিরের বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে তখন লুসিফেরাস নামক উৎসেচকের উপস্থিতিতে জারিত হয়। আর ঐ কারণেই নির্গত হয় শক্তি এবং সেই শক্তির প্রকাশ ঘটে হালকা নীল আলোর মাধ্যমে, লুসিফেরিণ আবার ফসফরাসের একটি যৌগ। দিনের বেলায়ও ওদের দেহ থেকে শক্তি নির্গত হয় কিন্তু সূর্যের তীব্র আলোকে আদৌ ধরা পড়ে না! এমন কি সন্ধ্যার আবছায়া আঁধারেও না।

ওদের আলোর একটা বড় বৈশিষ্ট্য, ওতে তাপ নেই। অর্থাৎ ওদের দেহনিঃসৃত আলো একেবারে শীতল আলো। এত শীতল যে, ঐ আলোতে দিনের পর দিন একটা থার্মোমিটারের কুণ্ডকে গুঁজে রাখলেও একটুও পারদ প্রসারিত হবে না। অথচ মানুষ আজ পর্যন্ত যত রকমের আলো উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছে তাদের মধ্যে একমাত্র ফসফরাসের জারণ ছাড়া অন্য কোন আলো আদৌ শীতল নয়। সর্বক্ষেত্রেই কিছু না কিছু তাপ উৎপন্ন হয়। তাপবিহীন আলো যেন কল্পনাই করা যায় না। সেদিক থেকে ওদের প্রকৃতির এক বিচিত্র সৃষ্টি বলা যেতে পারে।

শীতল এই নীল আভাযুক্ত আলোর যেন একটা যাদু আছে। এই জাতীয় আলোতে ঘরকে আলোকিত করতে পারলে এক স্বপ্নময় পরিবেশের রচনা করা যেতে। কিন্তু জোনাকির দেহ থেকে লুসিফেরিণ সংগ্রহ করে ঘরকে আলোকিত করতে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কারণ ঘরকে আলোকিত করতে যে পরিমাণ আলোর দরকার তাতে লক্ষ লক্ষ জোনাকিকে ধ্বংস করতে হবে। তবে লুসিফেরিণকে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যায়। বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় আজকের দিনে জৈব ও অজৈব কোন যৌগকে যে তৈরি করা যায় না এমন নয়। কিন্তু খরচে পোষাবে না।

অর্থবান ও সৌখিন কোন ব্যক্তি যদি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অনুরূপ লুসিফেরিণ তৈরি করে ঘরকে আলোকিত করতে যান, তাতে লাভ কিছু হবে না। অধিকন্তু বিভ্রান্ত হবেন। কারণ, ঐ জাতীয় আলোতে কোন রঙের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বেনা। সাদা, লাল, হলদে, কালো, সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে। সবইবেখাপ্পা ঠেকবে চোখের সামনে! আনন্দের পরিবর্তে বিরক্তিতে ভরে উঠবে মন। সত্যই যেন সৃষ্টি হবে অপার্থিব কিংবা কল্পনার সেই অশরীরীদের পরিবেশ।

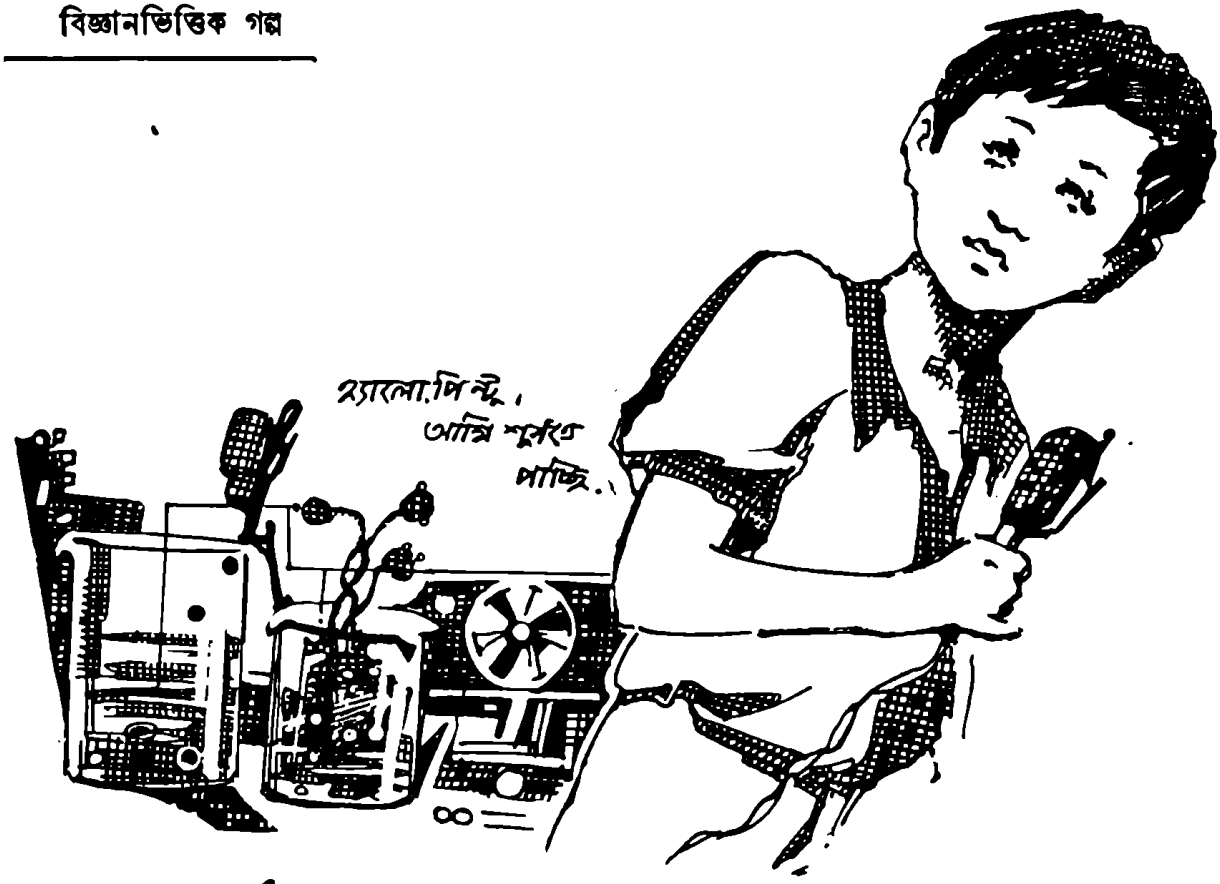

ভাইরাস

অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

যশোর রোডের ওপর বাড়িটা বিশাল বাগান দিয়ে ঘেরা। সেই বাগানের এক কোনে ছোট একটা হলদে রঙের একতলা বাড়ি। ওইটাই পিন্টুর কাকা ডঃ অম্বরীষ চট্টরাজ আর তার সহকর্মী ডঃ অনিল বসুরায়ের গবেষনাগার আর তাদের ব্যবসা 'নবভারত রাসায়নিক সহযোগিতা সংস্থার' অফিস। নানারকম রাসায়নিক গবেষণা করে যাঁরা যে রকমের উপদেশ বা সহযোগিতা চান—তাই তাঁরা দেন।

পিন্টু এখন ক্লাস নাইনে পড়ে। কিন্তু তাহলে কি হবে—কাকার গবেষণাগারটা তাকে সব সময় চুম্বকের মতো টানে। সময় পেলেই সে ওখানে ছুটে যায়। কাকাদের কাজকর্ম দেখে, নিজেও সুবিধে মতো নানান জিনিস নিয়ে আজগুবি পরীক্ষা চালায়। কাকা আর অনিলকাকা হাসেন পিন্টুর কাণ্ড-কারখানা দেখে! কিন্তু গতকাল থেকে গবেষণাগারে পিন্টুর ঢোকা বারণ হয়ে গেছে, বিশেষ এক সর্তকতার জন্য।

মেদিনীপুরের কোন্ এক অজ্ঞাত গাঁয়ের এক অদ্ভুত নোনাজলের পুকুর থেকে কাকা কয়েকদিন আগে কিছু জলের নমুনা নিয়ে এসেছিলেন। কোন সুদূর অতীতে ওই জায়গায় সমুদ্র থাকার কারণেই হয়ত পুকুরের জলটা ছিল সমুদ্রের জলের মতোই নোনা। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ সেই জল যেন তীব্র এ্যাসিড হয়ে গেছে। পুকুর কোন মাছ, জলজ গাছ-গাছড়ার চিহ্ন নেই। কোন পোকামাকড় বা পাখিও ভুল করে সেই জল আর খায় না। এছাড়া বহুলোকের এ্যাসিডে হাত পুড়েছে। এর কোন কারণই পাওয়া যাচ্ছিল না।

কাকা অম্বরীষ চট্টরাজও গতকালের এক বিশেষ ঘটনার আগে পর্যন্ত ব্যাপারটা ধরতে পারেন নি। গতকাল পিন্টুর তাড়া খেয়ে পাড়ার চোর লোভী বেড়ালটা গবেষণাগারে ঢুকে পড়ে। গবেষণাগারের টেবিলে একটা গিনিপিগ ওষুধের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তাকে দেখে বেড়ালটা লোভে লাফ মেরে র‍্যাকের ওপর ওঠবার সময় কাচের পরীক্ষানলে রাখা সেই জলটা উলটে ফেলে। এখানেও হল ঝামেলা। লোভে সেই জল চাখতে গিয়ে মর্মান্তিক চিৎকার করে উঠে বেড়ালটা লাফিয়ে পাশের একটা খালি গামলায় পড়ে যায়। দু-এক সেকেণ্ড ছটফট করেই সে স্থির হয়ে গেল। ঘটনার ঘোরটা কাটিয়ে ওঠার আগেই আরও একটা ঘটনা ঘটে তাদের চোখের সামনে। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই বেড়ালটার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তার জায়গায় জলের মতো কোন পদার্থ টলটল করতে থাকে। কৌতূহলবশত কাকা ওই পদার্থটা একটা কাচের বড় জারে ঢেলে রাখবার সময় নিজের হাত পুড়িয়ে ফেলেন! সঙ্গে সঙ্গে কার্বলিক এ্যাসিড ব্যবহার করতে সুফল পান। তাতেই তিনি ওই জলের রহস্য খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস ওই পুকুরের জলে সাংঘাতিক ধরনের কিছু অতি ক্ষুদ্র জীবানু বাসা বেঁধেছে। এদের সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না। এদের বলে ভাইরাস। সুতরাং পিন্টুর গবেষণাগারে এখন ঢোকা বন্ধ।

পিন্টুর এখন গরমের ছুটি। বাড়িতে মা আর কাকিমা ঘুমোচ্ছেন। বাবা অফিসে। গবেষণাগারের ওই জার ভর্তি তরল পদার্থটা তাকে টানছে। বিশেষ ধরনের একটা পরীক্ষা করার কথা তার মাথায় খেলে গেল। ঘুমন্ত অবস্থায় পশুপাখির মস্তিষ্কের 'শ্রুতিকেন্দ্র' কাজ করে কিনা দেখবার জন্য কাকারা একটা বিশেষ বেতার যন্ত্র তৈরী করেছেন। পিন্টুর বৈজ্ঞানিক মনে এখন একটা চিন্তা হঠাৎই পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে ভাইরাস অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবানু হলেও প্রাণী তো বটে! ওই জলের সঙ্গে যদি সে বেতার সংযোগ করে—তাহলে কি তাদের প্রাণের সাড়া পাওয়া যাবে না? কাকারা তার এই উদ্ভট পরিকল্পনার কথা শুনলে হয়ত আমলই দেবেন না। সুতরাং গাছের আড়ালে ঘুঘুর ডাক শুনতে শুনতে সে সুযোগের সন্ধানে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার যদি গবেষণাগারটা আধ ঘণ্টার জন্যও ফাঁকা পাওয়া যায়।

অবশেষে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। গাছের আড়াল থেকে পিন্টু দেখতে গেল কাকা আর অনিল কাকু গাড়ি করে হঠাৎ কোথায় বেরিয়ে গেলেন হন্তদন্ত হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে পিন্টুও গবেষণাগারের দরজায় হাজির। তাকে দেখে বেয়ারা রামচন্দ্র যেন হাতে স্বর্গ পেল।

রামচন্দ্র বলল, ছোট বাবু, তুমি তো আছ এখানে। আমি একটু ঘুরে আসি।

বাবুরা কোথায় গেল?

বড় পোষ্ট অফিসে ফোন করতে। এখানকার ফোনটা ঠিক কাজ করছে না। আধ ঘণ্টার ভেতরই এসে পড়বেন।

পিন্টু কোন কথা না বলে রামচন্দ্রকে যাবার ইশারা করে সটান গবেষণাগারের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

বেতার যন্ত্রটা কোথায় থাকে কি ভাবে লাগাতে হয়, সবই পিন্টুর নখদর্পনে। চটপট সব ঠিকঠাক করে নিয়ে সে তারের দুটো প্রান্ত জারের তরলের ভেতর ডুবিয়ে দিল।

এক সময় পিন্টুর মনে হল তরলটা যেন নড়ছে। কাঁপছে। ঢেউ উঠছে ওর বুকে। জীবন্ত না হলে তো এমন হবার কথা নয়। গোটা তরলটাই কি তাহলে জীবন্ত। ভাবতেও তার রোমাঞ্চ জাগল। মাইক্রো-ফোনটা ধরে পিন্টু বলল, হ্যালো, হ্যালো। শুনতে পাচ্ছ?

না। কোন সাড়াশব্দ নেই। অনেকক্ষন হ্যালো হ্যালো করার পর হতাশ হয়ে পিন্টু জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে দেওয়া মনস্থ করল। কাকারা এসে যদি দেখে ফেলে···! হঠাৎ পিন্টু চমকে উঠল,

লাউডস্পীকারটায় তারই কণ্ঠস্বরে কে যেন বলল, হ্যালো, পিণ্টু। আমি শুনতে পাচ্ছি।

আরে! এ যে আমার নামও জানে দেখছি পিণ্টু ভাবল।

হ্যাঁ, আমি কদিন ধরে সবই তো শুনছি। শুধু বলতে পারছিলাম না। এখন তুমি বুদ্ধি করে একটা উপায় করে দিলে। সাবাস!

আনন্দে নেচে উঠল পিণ্টু। একটা নতুন ধরনের জীবন সে আবিষ্কার করেছে। তুমি কি ভাইরাস? পিণ্টু জিজ্ঞেস করল।

ভাইরাস কি?

ভাইরাস। দাঁড়াও, দাঁড়াও, কাকার বিশ্বকোষটা আনাচ্ছি। পিণ্টু লাফিয়ে গিয়ে তাক্ থেকে বিশ্বকোষটা পেড়ে নিয়ে এল। সেদিন কাকাকে সে পড়তে দেখেছিল জায়গাটা।

পিণ্টু সবে পড়া শেষ করেছে এমন সময় কাকার গর্জনে চমকে উঠল পিণ্টু কি সর্বনাশ করছিস···। তোকে না···।

কোন কথা কানেই নিল না পিণ্টু। বলল, কাকা. আমি নতুন ধরনের এক, জীবন আবিষ্কার করেছি।

মিথ্যে কথা। যত সব···।

লাউডস্পীকার হঠাৎ বলে উঠল, না। সত্যি কথা, ডঃ চট্টরাজ। আমি এক উন্নত জীবন। তোমাদের থেকেও শ্রেষ্ঠতর।

পিণ্টুর কাকা আর অনিল কাকু চোখ গোল গোল করে তাকালেন আর ভর্তি সাদা তরল পদার্থটার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে?

আমি ভাইরাস। আমরা সেই নোনাপুকুরের অংশ ছিলাম, এখনও সেখানে রয়েছি।

আমি···আমরা·· মানে···তোমরা ক'জন···?

আঃ! বিরক্তি প্রকাশ করল ভাইরাস। আমি, আমরা সব একই। আমি নিজেকে ভেঙে ভেঙে লক্ষ লক্ষ···আবার সবই আমরা···। যাক্ বাজে না বকে আমায় কিছু বই পড় শোনাও তো···। ভাইরাস আদেশ করল।

নতুন কি অদ্ভুত জীবনের আবিষ্কারেও মশগুল হয়ে তিনজনে রাত দশটা পর্যন্ত নানান বই পড়ে শোনালেন। শেষকালে ডঃ চট্টরাজ বলতে বাধ্য হলেন, যে তাঁরা এবার বিশ্রাম নেবেন।

বিশ্রাম···সেটা আবার কি? বিশ্বকোষ থেকে পড়ে শোনাও।

অবশেষে তাই করে সবাই রাতের মতো ছুটি পেলেন।

নতুন আবিষ্কারের কথা গোপন রেখে তিনজন পালা করে বেশ কয়েকদিন ধরে নানান বই পড়ে শোনালেন। নানান জ্ঞানের কথা, কিন্তু শেষের দিকে ভাইরাস যেন কেমন খিটখিটে হয়ে উঠছিল। তাই সেদিন ডঃ চট্টরাজ রেগে গিয়ে ভাইরাসকে বললেন, তুমি বড় অভদ্রভাবে কথাবার্তা বলছ। একে তো আমাদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে তোমাকে নিয়ে···আয়···।

ওহো, বুঝেছি, আমার তরলে নুন কমে গেছে। একটু নুন মিশিয়ে দাও। তাহলে আমার মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে। আর শোন, কথা দাও তোমরা আমাকে···আমাদের মরা জন্তু জানোয়ার, মাছ খাওয়াবে—অবশ্য জ্যান্ত হলেও ক্ষতি নেই। আর বই পড়ে শোনাবে। বদলে আমি তোমাদের গবেষণার সব সমাধান করে দেব।

ভাল প্রস্তাব, পিণ্টুর কাকু অনিল বসুরায় বললেন। পিণ্টু বলল, বা-বা! তাহলে আমার অঙ্কগুলো—জ্যামিতির একষ্ট্রা···।

তাও করে দেব পিণ্টু। দাও এবার খানিকটা নুন নিয়ে এস।

চামচে করে নুন মেশাতেই সেই তরলে ভীষণ চাঞ্চল্য জাগল। ঢেউ উঠতে লাগল। লাউড স্পীকারে ভাইরাসের কণ্ঠস্বর শোনা যেতে থাকল, আরও নুন আরও নুন দাও। আমি···আমরা নিজেকে কোটী কোটী বারে পৃথিবী, সমুদ্র সব ছেয়ে ফেলব! সব প্রাণী খেয়ে ফেলব। আরও নুন দাও।

কি ভয়ানক ব্যাপার।

চটপট বেতার সংযোগটা খুলে ফেলে অনিল বসুরায় বললেন, ও নেশাগ্রস্থ হয়ে গেছে। ওকে আমাদের মেরে ফেলা উচিত। পৃথিবীর ভালর জন্যে এ কাজ আমাদের করতেই হবে।

পিন্টু বলল, না না। এই জারে আটকা থাকলে ও আর কি করবে। কাকা, বরং এক কাজ কর। বেশির ভাগ তরলটা ফেলে দিয়ে তাতে জল মিশিয়ে দাও। তাহলে নুনটা কমে যাবে—আর বাকি যেটুকু থাকবে—তাতে ঐ একই ভাইরাসও থাকবে।

সেটাই করা হল। তরল ভাইরাসের বেশ কিছু অংশ কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে নিষ্প্রাণ করে দেওয়া হল?

তারপর আবার জারের তরলটুকুর সঙ্গে বেতার সংযোগ করা হল। ভাইরাসের দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আমার কি হয়েছিল? একটু নুন মেশাও।

ডঃ চট্টরাজ এবার নুন মেশাতে থাকলেন। ভাইরাস এক সময় বলল, ঠিক আছে। এবার বল, আমার কি হয়েছিল?

পিন্টুর কাকা সব খুলে বললেন।

ভাইরাস রেগে চিৎকার করে উঠল, তোমরা আমাকে—আমার লক্ষ লক্ষ সয়ামকে—ভাইকে হত্যা করেছ। জান না, বেশি মিষ্টি জল মেশালে আমরা মরে যাই।

ওরা তিনজন বলল, আমাদের ভুল হয়ে গেছে।

ভাইরাসের রাগ পড়ল। সে বলল, বেশ, ভবিষ্যতে আর এমন কোর না মূর্খ মানুষের দল। যাক, বল তোমাদের কি সমস্যা···?

তিন মাসে 'নবভারত রাসায়নিক সহযোগিতা সংস্থা'র ব্যবসা বেশ বিরাট হয়ে গেছে। ভাইরাসের জারটাকে এখন একটা শব্দ নিরোধক ঘরের টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে। মাইনে করা লোকেরা ঘরের বাইরে থেকে মাইক্রোফোনের সাহায্যে দিনরাত পৃথিবীর তাবৎ তত্ত্ব পড়ে শোনায় তাকে। ঘরের ভেতর পিন্টু, ডঃ চট্টরাজ আর বসুরায় ছাড়া কারোর ঢোকার হুকুম নেই। পিন্টু পরীক্ষায় সব বিষয়ে প্রথম হয়েছে। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ভাইরাস বলে দিয়েছে, আর পিন্টু তা লিখে নিয়ে মুখস্থ করেছে।

সে দিন সকালে নিয়মিত তিনজন ভাইরাসের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। জার খালি। ডঃ চট্টরাজ ও অমর বসুরায়ের তো পাগল হবার মত অবস্থা, ব্যবসার কি হবে? কে সমস্যার সমাধান করবে এতো চটপট? ডঃ চট্টরাজ বললেন, দেখ, দেখ। কার্পেটের কোথাও ভিজে আছে কিনা। জল মিশিয়ে আবার ওকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। নইলে পুকুরের ভাইরাসকে তৈরি করতে অনেক সময় লাগবে। ততদিন কি হবে···?

হঠাৎ পিন্টু চেঁচিয়ে উঠল, কাকা, দেখ, দেখ।

দেখা গেল জেলি ফিসের মতো ছোট্ট একটা থল থলে জীব শুঁড় বার করে ঘরের কোনায় কার্পেটের ওপর দিয়ে হাটছে। পিন্টু খালি জারটা নামিয়ে এনে খোলা মুখটা জীবটার সামনে ধরল। জীবটা হাঁটতে হাঁটতে জারের মধ্যে ঢুকে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে জারের সঙ্গে বেতার সংযোগ করা হল। লাউড স্পীকারে ভাইরাসের উত্তেজিত খুশি করা স্বর শোনা গেল, দেখেছ, দেখেছ। এখন আমি হাঁটতে পারি। আমি এখন প্রাণী।

তিনজনে কিন্তু ভাইরাসের এই অভূতপূর্ব সাফল্যে মোটেই আনন্দিত হতে পারল না। কারণ ব্যাপারটা ভয়ের। ভাইরাস একবার যদি পালাতে পারে তাহলেই পৃথিবীর মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ভাইরাস বলল, আমি তোমাদের এই ক'মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তোমরা এবার আমায় একটা প্রতিদান দাও। আমাকে সেই নোনা পুকুরের জলে মিশিয়ে দাও। আমি আমার সমস্ত জ্ঞান পুকুরের সবার কাছে, আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। তারপর

[এরপর ৫১ পাতায়]

কি ভাবে
প্রথম আলো-বাতি তৈরী হয়?

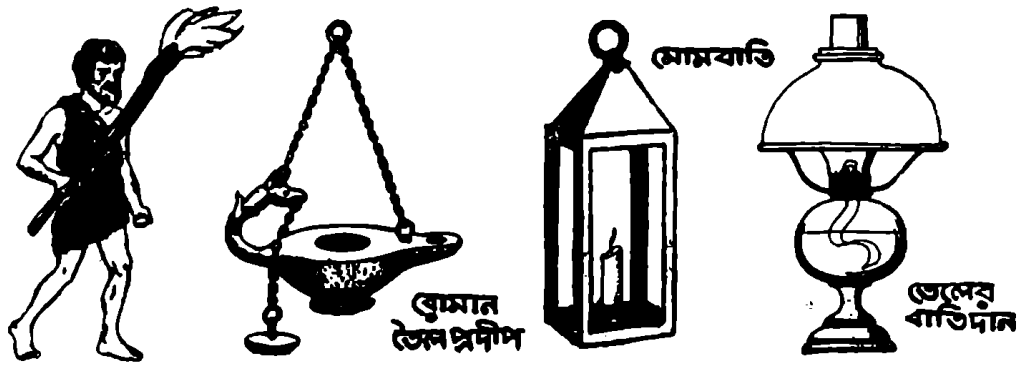

আগুন আবিস্কারের আগে কেবল সূর্যের কাছ থেকেই মানুষ তাপ এবং আলো পেয়ে থাকত। কিন্তু সেই তাপ এবং আলোর ওপর তার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা না থাকার দরুণ ঠাণ্ডা এবং অন্ধকারের মোকাবিলা করা তার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল তখন।

সম্ভবত এক লক্ষ বছর আগে মানুষ প্রথম আগুন আবিস্কার করে থাকবে। তারপর সে লক্ষ্য করতে থাকে কোন কোন বস্তু অন্য জিনিষের থেকে বেশি ভাল জ্বলে। সম্ভবত আগুনে জন্তু-জানোয়ারদের কাঁচা মাংস পুড়ানোর সময় সেই সব মাংসের টুকরো থেকে নিস্তৃত চর্বি আগুনে পড়ে বেশ ভালই জ্বলছিল। দিন যত যায়, মানুষ তাদের জ্বালানির উপযোগী ভাল ভাল বস্তু আবিস্কার করতে থাকে। আলো, আরো আলো পেতে চায় সে। পাতলা কাঠের টুকরো দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা হত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। পাইন গাছের ছালের তৈরি গ্রন্থি আজকের টর্চের মত ব্যবহার হত তখন। জন্তু-জানোয়ারদের চর্বি পাথরের পাত্রে রেখে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার হত। তেলের বাতির আবিস্কার সেই থেকেই প্রথম। তবে ঠিক কবে এই তেলের বাতির আবিস্কার জানা নেই আমাদের।

জন্তু-জানোয়াদের চর্বি গলিয়ে প্রথম মোমবাতি তৈরি করা হয়। পরে সেই গলিত চর্বি বাঁশের গর্তে ঢেলে বাতির মত ব্যবহার করা হত সেই সময়ে। যিশু খৃষ্টের জন্মানর আগেই মোমবাতির আবিস্কার ঘটে।

১৮২০ সাল নাগাদ নিউ ইংলণ্ডে চর্বি-তেলের ল্যাম্পে চর্বি ব্যবহার করার রেওয়াজ ছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অনেক অলিভ-গাছ দেখতে পাওয়া যায়। অতএব অলিভ তেল আলো-বাতির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হত সেখানে। চীন এবং জাপানের লোকেরা বিভিন্ন বাদাম থেকেও তাদের বাতির জ্বালানি হিসেবে সংগ্রহ করে আনতো হাট বাজার থেকে। প্রাকৃতিক তৈল এবং গ্যাস যদি না আবিস্কার হত তাহলে মনে হয় বাদাম তেল আজও আমাদের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যেত।

১৮৫৯ সালে পেট্রল আবিস্কৃত হয়। এই তেলকে আগুনে গরম করতে গিয়ে দেখা যায়, বর্ণহীন একটি প্রকৃতিক পদার্থ সংগ্রহ করা গেল। যার অপর নাম 'কেরোসিন তেল।' এই কেরোসিন তেল বেশির ভাগ লোকেরা তাদের বাতির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে? সত্যি কথা বলতে কি শুরুতে এই কেরোসিন তেলকে লোকে 'কয়লার তেল' হিসেবে চিহ্নিত করত কারণ তখনকার মানুষের ধারণা ছিলো, পেট্রোল এবং কয়লা পাশাপাশি দুটি খনিজ পদার্থ।

আজকের দিনে তুমি তোমার বাড়িতে তেলের ল্যাম্প রাখ না। অনেক বাড়িতে শলতির একটা তেলের ল্যাম্প রেখে দেওয়া হয়, জরুরী প্রয়োজনে। কখন লোড-শেডিং হয়ে যায় কে জানে?

□ পার্থ দত্ত

শল্যচিকিৎসা প্রথম কবে ব্যবহৃত হয় ?

রীতা দত্ত

আজকের দিনে আধুনিক হাসপাতালে শল্যচিকিৎসকের সাফল্যের সঙ্গে রুগীদের দেহ নিয়ে কাটা-ছেঁড়া করতে দেখে আমাদের মনে হবে এই শল্যচিকিৎসা বোধহয় আমাদের এই আধুনিক যুগেই আবিস্কৃত হয়েছে। কিন্তু তা নয়। আসলে শল্যচিকিৎসকের উৎপত্তি বহু প্রাচীনকাল থেকেই।

সারা পৃথিবীতে প্রাচীনকালের লোকেরা 'শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি হিসেবে চকমকি পাথরের ব্যবহার করত। সব থেকে বিপজ্জনক অস্ত্রোপচার হল মানুষের মাথার খুলি বা করোটি। আর প্রাচীনকালে সেই বিপজ্জনক অস্ত্রোপচার করা হত চকমকি পাথরের সাহায্যে। এবং সেটা ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগ। ফোড়া কাটানর জন্য এবং মানুষের দেহ থেকে রক্ত বার করার জন্যও চকমকি পাথরের ব্যবহার করা হত তখন। অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে মাছের কাঁটা এবং গাছের ধারাল কাঁটাও ব্যবহৃত হত সেই সময়ে। চোখের ছানিও গাছের কাঁটা দিয়ে অস্ত্রোপচার করা হত।

তাছাড়া হাত কিংবা পায়ের অংশ বিশেষ মানুষের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তখনকার দিনে শল্যচিকিৎসকরা চকমকি পাথর ব্যবহার করত। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বহু প্রাচীন মমির ওপর পরীক্ষা চালিয়ে।

মানুষ যখন ব্রোঞ্জ এবং লোহা থেকে যন্ত্রপাতি তৈরি করতে শিখল, তখনি কাঁচি, লোহার ছুঁচ এবং অন্যান্য আরো জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতে শুরু করল আধুনিক শল্য-চিকিৎসায় ক্ষেত্রে। এইসব উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানুষ আজ অনেক বেশি জটিল অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম হচ্ছে। তবে আজকের বেশির ভাগ অস্ত্রোপচার যা হচ্ছে, পরি-সংখ্যান থেকে দেখা যায়, প্রাচীনকালেও সেগুলো করা হত।

পমপেই-এর ধ্বংসাবশেষ থেকে কিছু কিছু জটিল অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। এবং সেই সব যন্ত্রপাতি থেকে বোঝা যায়, হাজার হাজার বছর আগে এ্যানেসথেসিয়া (যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য অস্ত্রোপচারের আগে রুগীকে অজ্ঞান করানর পদ্ধতি) প্রয়োগ না করেই রুগীর অস্ত্রোপচার করা হত। এমন কি দূষণ বা সংক্রামণের হাত থেকে রুগীকে আড়াল করার মত জ্ঞান ছিল না তখন-কার চিকিৎসকদের। তাছাড়া রুগীর প্রকৃত রোগ নির্ণয়ের আগেই তখনকার দিনে তার অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা হত। সর্বক্ষেত্রে তার সফলতা অর্জন করত সেই সময়, তা না হলে তারা তাদের সেই চিকিৎসা পদ্ধতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলতে পারত না।

যাইহোক, আধুনিক শল্য চিকিৎসায় সাফল্যের মাপকাঠি দুটি জিনিষ, এ্যানসেথেসিয়ার আবিস্কার এবং রুগীকে সংক্রামণের হাত থেকে রক্ষা করার উপায় নির্ধারণ।

আজও রহস্য

রহস্যে ঢাকা

এল ডোরাডো

ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

……এল ডোরাডো। নামটি পৃথিবীর মানুষের কাছে খুবই পরিচিত এবং রহস্যময়। কোনো কোনো সময়ে এক একটা নাম তার রহস্যময়তার প্রভাবে পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে থাকে। ঘিরে থাকে একটা রহস্যের কুহেলি ঘেরা জাল। অথচ রহস্যের সমাধান কোনোদিনই হয় নি এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্যও নয় কিংবা একেবারে অবিশ্বাস্যও নয় তা তোমাদের আগেই বলে রাখছি। এল ডোরাডো কথাটাই তেমনিই একটা কথা যার অস্তিত্ব সারা পৃথিবীর কোনখানে যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা নির্ণয় করতেই বহু লোকের বহু শ্রম ও অর্থ দুইই ব্যয়িত হয়েছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে অলীক অভিযানের কাজে কয়েকজনকে প্রাণ দিতে হয়েছে। সেই রহস্যভরা কাহিনীর কথাই আজ তোমাদের বলবো।

স্পেনীয় ভাষা এটি। এর আসল অর্থ হলো সোনা দিয়ে মোড়া। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেন দেশের অধিবাসীদের একটা বদ্ধ মূল ধারণা ছিল দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের কোনো এক জায়গাতে ভারতীয় একদল উপজাতী বসবাস করে। তাদের দেশে পথেঘাটে নাকি সোনা ছড়ানো আছে। সোনা ভারী লোভী বস্তু। এবং ওই দেশের রাজারও নাকি প্রচুর ধনসম্পদ এবং তা এই সোনা দিয়েই হয়েছে। আরো প্রচলন আছে প্রতি বৎসর কোনো এক উৎসবের দিনে রাজা তার গায়ে সোনার গুড়ো মাখেন। এল ডোরাডো বলতে সেই কল্পিত রাজার রাজধানীকেও বুঝাতো। উপকথার কাহিনীতে সেই স্বর্ণনগরীরই নাম ছিল মানোয়া বা ওমোসা। 'সো ইট ইজ নাইন ফ্যাক্ট দ্যাট ম্যানোয়া ওয়াজ এ সিটি অফ গোল্ড। দি কিং অফ দিজ সিটি ফল্ড গোল্ড এ্যান্ড হি ইজ এ গোল্ডেন প্যালেস টু লিভ ইন?' ঐতিহাসিকদের কথাগুলি ছিল আসলে এইরকম। সুতরাং বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের স্বর্ণনগরী এল ডোরাডো নাম নিয়ে ধরায় খুবই হৈ চৈ তুলেছিল একদিন। সেই রহস্যের ছায়া আজো বিছানা আছে সারা পৃথিবী জুড়ে। ঐ রহস্যের আজব সত্য কথা বলতে কি সমাধান সূত্র আবিস্কৃত হয় নি। আগেই বলেছি প্রচুর অর্থব্যয় করে পরিশ্রম করে মানুষ রহস্যের পশ্চাতে ছুটছে মৃগতৃষ্ণিকার মতই এবং এই অভিযানে তারা মারা যেতো, যারা কোনো রকমে অভিযান সেরে ফিরে আসতো তাদের অবস্থা আরো শোচনীয় আকার ধারণ করতো। নানা রকমের ব্যাধি ও শারিরীক কষ্টে তাদের প্রাণ ধারণই অভীষ্ট হয়ে উঠতো। ভগবানের অভিশাপে তাদেরও একদিন মৃত্যু হতো এল ডোরাডোর মৃগতৃষ্ণিকা সংগে নিয়ে। লোভে

পাপ আর পাপে মৃত্যু একেই বলে—তাই না? দেয়ার আর ম্যানি থিংস অন আরথ এল ডোরাডো ইজ ওয়ান অফ দেম ; একজন ভুক্তভোগিনীর উক্তি এটি এল ডোরাডো সম্বন্ধে।

আজ পর্যন্ত এল ডোরাডো খুঁজে বার করতে যতগুলি অভিযান হয়েছিল ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে। এবং এই বিরাট অভিযানের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন ফ্রান্সের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তার নাম ছিল 'ডিয়াগো কি ওরডে' (ডিগো ডি ওরভ্যান) শোনা গিয়েছিল ওই বিরাট দলের একজন সদস্য নাম ছিল তার মার্টিনেই—তিনি ওই স্বর্ণনগরী ওমোয়া খুঁজে পেয়েছিলেন এবং প্রচুর সোনা নিয়ে দেশে ফিরতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে শয়তানের অভিলাসে তিনি সোনার লোভের আনন্দে এতই আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন যে বাড়িতে ফিরে তিনি একবারে মূক হয়ে গিয়েছিলেন ; তাই স্বর্ণনগরীর সন্ধান অকারণে বলতে পারেননি মুখ ফুটে। কথাটা অবান্তর হলেও সত্য বলেই তদানীন্তনকারী লোকেরা, মেনে নিরেছিল। সুতরাং তারপর থেকে এল ডোরাডোর রহস্য আরো ঘনীভূত হয়েছিল এবং পৃথিবীর লোকেরা তাকে খুঁজে আনতে উঠে পড়ে লেগেছিল।

এবং পূর্বোক্ত অভিযানের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৫৪০। ৪১ খৃষ্টাব্দে নাগাদ আরো একটা অভিযান চালানো হলো ওই ফ্রান্স থেকেই। এই অভিযানের নেতা ছিলেন একজন ফরাসী বণিক। নাম ছিল তার ফ্রান্সিস ডি ওরলিয়ঁ (ফ্রানসিস ডে ওরসিলেয়াস) ইনি তার অভিযান ক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন আমাজনের অববাহিকা দুর্ভেদ্য জংগল। আমেরিকার এই নদীর উৎস বরাবর গিয়েও তিনি কিন্তু এই স্বর্ণনগরী খুঁজে পান নি। হতাশা নিয়েই শুধু তাকে ফিরতে হয়েছিল। অভিযানে বহুলোক হিংস্র শ্বাপদের কবলে প্রাণ দিয়েছিল এবং যারা ফিরেছিল তারা তাদের শরীরে বয়ে এনেছিল দুর্ভেদ্য জংগলের নানা ব্যাধি ও দুঃখকষ্ট। এবং পরে তাতেই তাদের মৃত্যু হয়েছিল বলে জানা গেছে।

১৫৪১ সালে আবার একবার অভিযান চালানো হয়েছিল ওই আমাজন নদীর অববাহিকার দুর্ভেদ্য জংগলে। এর দলনেতা ছিলেন ফিজিল ভন হিউটেন নামে একজন স্পেন-দেশের বনিক। ইনি ভেনেজুয়েলা তীরবর্তী অঞ্চল জার্মান অধিকৃত কোরো থেকে ওমানোয় অঞ্চল পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুজেছিলেন স্বর্ণনগরীকে কিন্তু হতাশ হয়ে তাকেও ফিরেও হয়েছিল। রহস্যময় স্বর্ণনগরী এল ডোরাডো আসলে রহস্যের অন্তরালেই রয়ে গিয়েছিল। ওই অভিযাত্রীদের অনেকেই দারুণ ব্যাধিতে ও শ্বাপদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছিল। অলীক স্বর্ণনগরী অলীকভাবে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছিল রহস্যের কুহেলীতে। এল ডোরাডো তাই বলেছি রহস্যময় একটি নাম যার অস্তিত্ব নিয়ে আজো অনেকের মধ্যে বিশ্বাস অবিশ্বাসের ঝড় বয়ে চলেছে। এর সমাধান সূত্র কেউই পাচ্ছে না।

এরপর চার বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে নামে একজন ইংরাজ সাহেব 'এল ডোরাডোর অনুসন্ধান করেন এবং ইংলণ্ডে ফিরে এসে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা মনোজ্ঞ ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি সেই বর্ণনার মধ্যে গায়না অঞ্চলের হ্রদে পরিম অবস্থিত ছিল 'বণ'-নগরী বা 'এল ডোরাডো'। র‍্যালে সাহেব সেই স্বর্ণ-নগরীকে দূর থেকে দেখে দেশে ফিরে এসেছিলেন। দুর্গন্ধময় এবং শ্বাপদ সংকুল সেই দ্বীপে তিনি পৌঁছুতি ভরসা পান নি। এরপর তার অভিজ্ঞতা মতো পারমা হ্রদটি দুইশতক ধরে মানচিত্রে বসানো হতো। অবশেষে তার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে মানচিত্রে হতে তার নাম মুছে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছিল স্বর্ণনগরী এল ডোরাডো।

এমনিভাবেই বিশ্বাসে অবিশ্বাসে মিলিয়ে এল ডোরাডো নামটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল আসলে কোনো স্থানে কল্পনাতীত ধনরত্ন কিংবা তা ক্ষয়ের কোনো সম্ভাবনা থাকলেই সেই স্থানের নাম হতো এল ডোরাডো। পৃথিবীর সাহিত্যে নামের অধিক পরিহাস দেখা যায় আজো। তাই মনে হয় এল ডোরাডো অবশ্যই পৃথিবীর কোনো না কোনো স্থানে আছে, তাকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব তোমাদের মতো কিশোর হবে—দেখো না চেষ্টা করে এল ডোরাডোর রহস্যটা ভেদ করতে পারো কিনা? রহস্য যেমন আছে তেমনি তার সমাধান অবশ্যই আছে তাই না, বলো তোমরা?

নক্ষত্র লোকের মহাকাশযান

প্রসাদ সেন

লোকটার চেহারা দেখে প্রথমে পল্টু একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। কি লিকপিকে চেহারা! যেন অনেকগুলি সরু পাইপ দিয়ে লোকটার শরীর তৈরি। মুখের আকারও তেমনি। মস্তবড় মাথায় চুলটুল কিছু নেই! টিয়াপাখীর মত গোল চোখ আর বাঁকানো ঠোঁট। আসলে ঠোঁট অথবা নাক—কোনটা সে কি পল্টু বুঝেই উঠতে পারছিল না।

এহেন লোকটা, বিদঘুটে গোল চকচকে চারটে পায়ার উপর দাঁড়ানো একটা বাড়ির সামনে শুয়েছিল। আশে পাশের সব গাছ-টাছ, ঘাস জমি যেন পুড়ে গেছে। আসলে পল্টু এদিকে খুব কমই আসে। জায়গাটা পল্টুর মাসির। পোড়ো জমি। চাষবাস না করার ফলে ঝোপ জঙ্গল আর কয়েকটি গাছ জন্মে গেছে। আজ এদিকে আসার কারণ হলো—পল্টুর মাসি নাকি কাল রাতে এখানে দপ করে আগুন জ্বলতে দেখেছে। আজ তাই শনিবারের হাফ-স্কুলের পর, বাড়ি ফিরবার পথে পল্টু দেখতে এসেছে—ব্যাপারটা কি। আর এসেই দেখল—অদ্ভুত বাড়িটার সামনে চোখ বন্ধ অবস্থায় শুঁড়ওলা শরীর নিয়ে লোকটা পড়ে আছে।

এমন একটা বিদঘুটে লোকের জন্য কি করতে পারে পল্টু? লোকটা অসুস্থ। কাল রাত থেকেই বোধহয় এখানে পড়ে আছে। এক্ষুনি শুশ্রূষা করা দরকার। সহরে একটা লোক অসুস্থ হয়ে পথের ধারে পড়ে থাকতে পারে।

কিন্তু গ্রামে ওটি হবার জো নেই। গ্রামের ছেলে পল্টু তাই লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। দেখল—অদ্ভুত বাড়িটার একটা দরজা খোলা। সেই খোলা দরজার সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে লোকটা। মরে যায়নিতো? খুব কাছে গিয়ে ঠোঁটের মত নাকের কাছে হাত রাখল। মনে হয় যেন নিশ্বাস পড়ছে। বেঁচে আছে তা হলে।

পল্টু ডাকল—'এই যে শুনছো?'

দুবার ডেকেও সাড়া পেলনা পল্টু। তৃতীয়বারে ওর হাত ধরে ঝাঁকালো। কি নরম শরীরে বাবা। যেন তুল তুল করছে। কিছুক্ষণ ঝাঁকাতে গোল গোল চোখ দুটো খুব আস্তে মেলে ধরল লোকটা। অস্পষ্ট, বিদঘুটে উচ্চারণে বিড় বিড় করে কি যেন বলল।

আবার ডাকল পল্টু—'শুনছো? কি হয়েছে তোমার?'

এবার পরিপূর্ণ ভাবে তাকাল লোকটা। পল্টুকে দেখে যেন খুব অবাক হয়ে গেল। উঠে বসতে চেষ্টা করাতে ওকে ধরে বসিয়ে দিল পল্টু। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে লোকটা তাকিয়ে থাকে।

'তোমার কি অসুখ করেছে?'

মাথা নাড়ল লোকটা। তারপর বাঁশির মত গলায় প্রশ্ন করল—'আমি কোথায়?'

'আরে এতো আমাদের মানিকপুর গ্রাম। তোমার দেশ কোথায়?'

'টাউসেটি—টাউসেটি নক্ষত্রলোকের ও-এক্স গ্রহ।'

'টাউসেটি? ওএক্স গ্রহ?' অবাক হয়ে গেল পল্টু। এমন দেশের নাম জন্মে শোনেনি। লোকটার মাথাটাথা খারাপ হয়ে যায়নিতো? বলল, 'তুমি এখানে কি করে এলে? ওটা কি তোমার উড়ো জাহাজ? ভেঙ্গে গেছে?'

গোল চক চকে বাড়িটার দিকে তাকাল লোকটা। বলল, 'কি যে হলো—বুঝতে পারছি না।'

'তোমার নাম কি?'

'ও-এক্স ৩ জেড'।

'যাঃ, এমন নাম কখনো হয়? সন্ধি করে বল না, তুমি কোত্থেকে এসেছ, তোমার নাম কি?'

'আমি টাউসেটির এক্স-এর লোক। আমার নম্বর ও-এক্স ৩ জেড-এ।'

'যাকগে। তোমাকে আমি টাউদাদা বলেই ডাকব এখন বলোতো, একটু সুস্থ বোধ করছ? জল খাবে?'

একটু চুপ করে থেকে লোকটা বলল, 'একটা কাজ করবে? ওই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে যাও। ডান দিকে আর একটা দরজা পাবে! সেখানে অনেক র‍্যাক-এর মধ্যে ছ'নম্বর র‍্যাকে একটা নীল টিউব আছে। ওটা এনে দাও। আমি উঠতে পারছি না।'

'এ আর এমন কি কাজ।'

দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল পল্টু। বাড়িটার ভিতর কত রকমের অজানা জিনিষ। জীবনে কখনো দেখেনি, শোনেনি। হরেক লাল নীল হলদে সবুজ আলো জ্বলছে আর নিভছে। এত আলো কোথা থেকে এল? যাত্রাদলের মত জেনারেটার আছে নাকি? হবে হয়তো। মসৃণ চকচকে মেঝে দিয়ে হাটতে গিয়ে পল্টুর পিছনে পড়বার উপক্রম। এইতো ডানদিকে আর একটা দরজা। বন্ধ দরজার কাছে যেতে আপনা থেকে খুলে গেল ওটা। ভিতরে ঢুকতেই আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। পল্টু ভয় পেল। তা'হলে কি বের হতে পারবে না? লোকটার কথা শুনে বোকার মত কাজ করল নাতো? পিছন ফিরে দরজার কাছে আসতেই দরজা খুলে গেল আবার। এবার ভারি মজা লাগল পল্টুর। দু'তিনবার যাতায়াত করে বুঝল—এখানে এমন কলকব্জা ফিট করা আছে যাতে সে সামনে গেলেই দরজা খুলবে।

এই ঘরটাতেও কত আলো আর যন্ত্রপাতি। সিনেমার মত বড় একটা পর্দা টাঙ্গানো। কিন্তু এ আবার কি? অনেকগুলি বড় পুতুল গড়াগড়ি যাচ্ছে মেঝেতে। ওদের মাঝখানে বাইরের লোকটার শরীরের অনেক পাইপ ভাঙ্গা, মুচড়ানো এবং ছেঁড়া। যাক, এবার ছ'নম্বর র‍্যাক খুঁজতে হবে। এইতো, এক-দুই-তিন-চার-পাচ-ছয়। একটা বড় আকারের টিউব রয়েছে সেখানে। টিউবের ভিতর কি আছে? হয়তো কোন অষুধ আছে লোকটার।

টিউবটা হাতে নিয়ে ছেঁড়া-খোঁড়া লোকটা আর পড়ে থাকা পুতুলগুলির দিকে তাকাতে তাকাতে বাইরে এল পল্টু। টাউদাদা আবার নেতিয়ে পড়েছে। টিউবটা তার হাতে দিতে টিয়াপাখীর মত ঠোঁটের ফাঁক করে কি সব জিনিষ গলায় ঢেলে দিল লোকটা। পল্টু ভাবছিল—এবারে নিশ্চয় টাউদা সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু তার বদলে সে আবার ঢলে পড়ল।

এখন পল্টু কি করে? টাউদা মরে যায়নি। এই অদ্ভুত দর্শন লোকটার উপর করুণা আর মমতায় পল্টুর বুক ভরে গেল। ঠিক করল—টাউদাকে বাড়ি নিয়ে যাবে। মাসি আর সে সেবা-শুশ্রূষা করে ভাল করে তুলবে। তারপর যদি টাউদা তার উড়োজাহাজ নিয়ে টাউসেটি নক্ষত্র-লোকের কোন দেশে চলে যেতে চায়—যাবে। আর যদি

থাকতে চায়, মাসির নিশ্চয় আপত্তি হবে না। তবে পল্টুরাতো গরীব। টাউদার খাবার ব্যবস্থা কি করতে পারবে?

আস্তে আস্তে থ্রীজেড্‌কে তুলে ধরল পল্টু। বলল, 'টাউদা, তুমি কি একটুও হাঁটতে পারবে না?'

থ্রী জেড চোখ মেলে তাকাল। তারপর মাথা থেকে তার অক্ষমতার কথা জানাল। অগত্যা পল্টু কাঁধে তুলে নিল তাকে। কি পলকা শরীর। একদম ওজন নেই। পাঁচ কেজি যদি হয়। অনেকদিন অসুখে-টসুখে ভুগেছে হয়তো। নইলে একজন বয়স্ক লোকের শরীরে এত কম ওজন থাকতে পারে? তার নিজের ওজনই ছত্রিশ কেজি।—ওকে কাঁধে তুলে হাঁটতে থাকে সে।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পল্টু হাঁক ডাক করতে থাকে—'মাসি, ও মাসি, দেখ একজন অসুস্থ লোককে নিয়ে এসেছি। আমার বিছানাটা চট করে পেতে দাওতো।'

পল্টুর হাঁক ডাক শুনে প্রথমে সে ছুটে এল—সে বাড়ির পালিত কুকুর কালু। কিন্তু পল্টুর কাঁধে বিচিত্র দর্শন জীবটি দেখে লেজ গুঁটিয়ে একটা ভয়ার্ত চীৎকার করল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে তীর বেগে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এর পরই খড় ছাওয়া মাটির বারান্দায় এসে দাঁড়াল মাসি। বয়স্ক শরীর। রাতের দরুণ একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। এক পলক দেখে নিল পল্টু আর লোকটাকে। তারপর তাড়াতাড়ি আবার ঘরে ঢুকে গেল। থ্রীজেডকে নিয়ে পল্টু ঘরে গিয়ে দেখতে গেল—মাসি ততক্ষণে বিছানা পেতে ফেলেছে। খুব সাবধানে শুইয়ে দেওয়া হল থ্রী-জেডকে। একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল সে। তারপর চোখ বন্ধ করল। আবার অজ্ঞানই হয়ে গেল বোধহয়।

'লোকটা কে পল্টু?' মাসি জিজ্ঞেস করল।

মাসিকে সব কথা খুলে বলল পল্টু। শুনে মাসির মুখ কোমলতায় ভরে গেল। বলল, 'আহারে, কাদের বাছা কে জানে। তুই একটু বোস ওর সামনে। খুব দুর্বল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। দেখি, গাইটা দুইয়ে একটু দুধ গরম করে খাওয়াতে পারি কিনা?'

থ্রীজেডে-এর কাছে বসায় পল্টু। চোখ বন্ধ অবস্থায় বিড়বিড় করে কি বলছে সে। অদ্ভুত সব শুনতে পেল পল্টু। যেন ভীষণ কঠিন অ্যালজেব্রা আর জিওমেট্রির অংক বলছে। অংকে নিশ্চয় খুব পণ্ডিত টাউদা। নইলে প্রলাপের মধ্যেও কঠিন অংক বলে কেউ?

কিছুক্ষণের মধ্যেই গরম দুধ নিয়ে এল মাসি! থ্রীজেড এর পাশে বসে বলল, 'বাবা টাউ, এই দুধ টুকু এক চুমুকে খেয়ে নাও তো।'

থ্রীজেড চোখ মেলে তাকাল। সামনে আর একজনকে দেখে অবাক হয়ে গেছে। ফিস ফিস করে বলল, 'এ কে?'

'এ আমার মাসি টাউদা। মাসি আর আমিই এ বাড়িতে থাকি। আর আছে ধবলী গাই আর কালু কুকুর।'

'মাসি? মাসি কি সম্পর্ক?'

অবাক হয়ে পল্টু বলল, 'সেকি, মাসি কি সম্পর্ক জান না? মা'র বোন—'

'মা? মা কাকে বলে?'

পল্টু কোন উত্তর দিতে পারে না। মা কাকে বলে—এই ব্যাখ্যা কোনদিন সে দেয়নি। এবং কেউ দিয়েছে, এমন কথাও শোনেওনি। কি একটা বলতে যাচ্ছিল পল্টু। ওকে ধমকে থামিয়ে দিয়ে মাসি বলল—'টাউ খুব অসুস্থ। ওর মাথার মধ্যে বোধহয় সব গুলিয়ে গেছে। বাবা টাউ, এই দুধটুকু খাও। আমার নিজের গোয়ালের ধবলী গরুর দুধ। কোন অশুচি পাবে না। আমি বেধবা মেয়ে-মানুষ। সুব শুচিতা নিয়ে থাকি। কোন ভয় নেই তোমার। দুধটুকু খেলেই তুমি চাঙ্গা হয়ে যাবে। খাও বাবা, খাও।'

থ্রীজেড আস্তে আস্তে বলল, 'মাসি, এই পৃথিবীর খাদ্য আমার সহ্য হবে না। যা কিছু খাবার, আমি খেয়ে নিয়েছি। তুমি আর ব্যস্ত হয়োনা। আমাকে শুয়ে থাকতে দাও। তা হলেই আমি সুস্থ হয়ে যাব।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'পল্টু আর তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ—'

'না, না, ওসব কথা বলোনা বাবা টাউ। কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ কোন কথা নয়। আমরা গরীব কিন্তু সকলের জন্যই করি। তুমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে—'

আবার চোখ বন্ধ করল থ্রীজেড। রোগা লিকলিকে হাত নেড়ে ওদের চলে যেতে বলল।

'ঠিক আছে টাউদা।' পল্টু বলল, 'তুমি ঘুমিয়ে নাও, আমরা যাচ্ছি।'

দরজা ভেজিয়ে ওরা বাইরে এল। মাসি বলল, 'তুমি ঘুমিয়ে নাও, আমরা যাচ্ছি।'

দরজা ভেজিয়ে ওরা বাইরে এল। মাসি বলল, 'তুই একবার বদ্যিবাড়ি যাবি নাকি পল্টু। টাউর অবস্থা খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে না। দুধ খেল না। বলল পৃথিবীর খাবার ওর সহ্য হবে না। এসব কথার মানে কিরে?'

ঠোঁট উল্টে পল্টু বলল, 'জানিনা। তবে এখন বাড়ি গেলে ফিরতে সেই অনেক রাত। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাস্তা। বড় ভাল্লুকটা খাবার উৎপাত শুরু করেছে। তার চাইতে রাতটা দেখাই যাক-না।'

কপালে হাত ঠেকিয়ে মাসি বলল, 'ঠাকুর, ঠাকুর, ঠাকুর, ঠাকুর, টাউকে ভাল করে দাও। কোথাকার ছেলে কোথায় এসেছে। ভালয় ভালয় ওর বাপ-মা'র কাছে ফিরিয়ে দিতে পারি, তবেই রক্ষা।—তুই আবার কোথায় চললি রে পল্টু? খাবি না?'

'একটু দাঁড়াও মাসি। টাউদাকে দেখে কালু হতচ্ছাড়া ভয়ে কুঁই কুঁই করতে করতে করতে কোথায় যে পালিয়ে গেল।'

বাড়ির আনাচে কানাচে খুঁজেও কালুকে পাওয়া গেল না। কোথাও নেই কালু। চেঁচিয়ে ডাকল—'এই কালু, কোথায় তুই?'

অনেক্ষণ হাঁকাহাঁকির পর পুরানো মরাই-এর নিচে কালুর সন্ধান পাওয়া গেল। ভয়ে সে বেচারা একেবারে আধমরা হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে পল্টু ওকে বের করে আনায়। পল্টুর কোলে চেপে কালু তখনো ভয়ে কাঁপছে। ওর মাথায় একটা চড় মেরে পল্টু বলল, 'আরে তুই করছিস কি—অ্যাঁ? এত সাহসী কুত্তা তুই। টাউদাকে দেখে ভয় পেলি কেন?'

'উত্তরে কালু তার নিজস্ব ভাষায় ঘ্যা-ও, ইও-ও, উহুঁ-অ করে কি সব বলল। আর একটা চড় মেরে পল্টু বলল, 'টাউদাকে ভয় পাবি না মোটে। ও আমায় দাদা হয়।'

কালু এবার পল্টুর কোল থেকে নেমে একটা বুক ডন দিল। তারপর সটান দাঁড়িয়ে তার মনোভাব ব্যক্ত করল—ও যদি তোমার দাদা হয়, তবে কোন ডর নেই।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই পল্টু আর মাসি গেল থ্রীজেডকে দেখতে। গত রাতে পল্টুর বিছানায় থ্রীজেড শুয়েছে, তাই মাসির সঙ্গে শুয়েছে পল্টু। মাসি প্রথমেই উঠে ঘরে টাঙ্গানো ঠাকুর দেবতাদের ছবিগুলিকে বার বার প্রণাম করে বলেছে—'টাউ যেন ভাল হয়ে যায়। আমি তোমাদের একদিন হরিলুট দেব ভগবানেরা।'

ঘরে ঢুকে ওরা দু'জনেই দেখতে পেল থ্রীজেড বিছানায় উঠে বসেছে। যদিও শারীরিক পরিবর্তন নেই, তবু অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে তাকে। থ্রীজেড ওদের দেখে হাসল। মাসি জিজ্ঞেস করল, 'বাবা টাউ, তুমি ভাল আছ তো?'

'ভাল আছি মাসি। তোমরা যা করলে আমার—'

মাসি ধমকে উঠল—'থামতো। বার বার এক কথা ভাল লাগে না। যাক। তুমি যে ভাল হয়ে যাবে আমি জানতুম। ঠাকুর দেবতাদের-কাছে আমি যে হরিলুট মানত করেছি।'

'ঠাকুর দেবতা? হরিরলুট, মানত?'

থ্রী জেড-এর অজ্ঞতাকে মোটেই পাত্তা দিল না মাসি। বলল, 'তুমি তো আবার পৃথিবীর খাবার খেতে চাইছ না। এখন তোমাকে কি খেতে দি? চাঁদ থেকে তো আর খাবার আনতে পারব না।'

'কিছু না খেলেও আমার চলবে।' থ্রী জেড বলল, 'যা খাবার আমি তা খেয়ে নিয়েছি। আর চাঁদে এক কণা খাবারও পাওয়া যায় না মাসি। যাক, এবার আমি স্লেজ-শিপ-এ যাব!'

'স্লেজ শিপ? তোমার ওই উড়োজাহাজটা?' পল্টু বলল।

থ্রী জেড একবার তাকাল পল্টুর দিকে। বলল, 'ও হ্যাঁ, আমার উড়োজাহাজটা। এবার ওটাকে সারাবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'আচ্ছা, উড়ো জাহাজটার মধ্যে তোমারই মত একটা লোক রয়েছে। তবে মনে হয় মরে গেছে। আর আছে কয়েকটা বড় বড় পুতুল।'

থ্রী জেড এবার চমকিত হয়ে পল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি ভিতরে ঢুকেছিলে?'

'বাঃ, কি ভুলো মন তোমার।' পল্টু বলল, 'তুমিই না আমাকে বললে ভিতর থেকে একটা টিউব এনে দিতে?'

'ওঃ। তা হবে। আচ্ছা, এবার আমি যাব।'

'আমি সঙ্গে যাব টাউদা? যদি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।'

'যাবে? চল। জানিনা, কি সাহায্য তুমি করতে পারবে।'

'দেখাই যাক। কালুকেও সঙ্গে নিচ্ছি। আয় কালু।'

এবার আর ভয় পেলনা কালু। লেজ নাড়তে নাড়তে থ্রী জেড ও পল্টুর পিছনে চলল। পোড়ো জমিটার কাছাকাছি এসে থ্রী জেড বলল, এই জমিটা তোমাদের? ফসল ফলে না কেন?'

'আসলে জমিটা খুব ভাল করে না চষলে হবে না। মাসির অত টাকা নেই যে লোক লাগিয়ে অথবা ট্রাকটার দিয়ে চাষ করবে।

থ্রী জেড কিছুক্ষণ চুপ করে হাঁটল। তারপর বলল, 'আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' [এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়]

ইতিমধ্যে ওরা মহাকাশযানের কাছে এসে পড়েছে। প্রথমে ওরা দু'জন এবং একটু ইতস্ততঃ করে কালুও ঢুকল ভিতরে। ডান দিকের ঘরে ঢুকল ওরা। ওখানকার দৃশ্য দেখে কালু আবার লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছিল। পল্টুর ধমক খেয়ে চোখ দুটো ছোট করে ঘরের এক কোণে বসে রইল কালু।

দেখা গেল—সত্যি সত্যি টাউসেটি নক্ষত্র লোকের ও-এক্স গ্রহের দ্বিতীয় প্রাণীটি মৃত। ওদের হয়তো মৃত্যু নেই। কিন্তু যে ভাবে তার শরীরের কয়েকটা অংশ টুকরো টুকরো হয়ে আছে, তাতে তার মৃত্যুই হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। দ্বিতীয় প্রাণীটির টুকরো অংশ গুলি বের করে আনল থ্রী জেড। তারপর সেগুলি বাইরে নিয়ে জমির উপর রেখে বলল, 'আমি না বলা পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে ভিতরে বসে থাকবে। খবর্দার চোখ খুলবে না। খুললে অন্ধ হয়ে যাবে। কালুর চোখও বন্ধ করতে হবে।'

কালুকে কোলে তুলে দু'হাতে চোখ বন্ধ করে, নিজেও চোখ বন্ধ করে বসে রইল পল্টু। একটা খুট খাট, গোঁ গোঁ শব্দ। কালু একবার মৃদু ভাবে চেঁচিয়ে উঠল। এক সময় খুব গরম লাগছিল পল্টুর। মনে হচ্ছিল—কাছাকাছি কোথাও খুব জোরে আগুন জ্বলছে। তারপর এক সময় শব্দ টব্দ বন্ধ হলো। উত্তাপ কমে গিয়ে ফিরে এল ঠাণ্ডা ভাব। শুনতে পেল থ্রী জেড বলছে—'এবার চোখ খুলতে পার।'

চোখ খুলে এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এল পল্টু। দেখল-যেখানে মৃত প্রাণীটিকে রাখা হয়েছিল, সেখানে কিছু পোড়া ঘাস ছাড়া আর কিছু নেই। পল্টু বলল, 'টাউদা, তুমি কি তোমার ভাই-এর সৎকার করলে?'

'সৎকার?—ও হ্যাঁ, সৎকার করলুম। জান পল্টু, ওই ৪১ কিউ'র জন্য আমার স্লেশ-শিপ'এর এই অবস্থা। ওকে মেরে না ফেললে ওই আমাকে শেষ করে ফেলত।'

পল্টু তাকিয়ে রইল থ্রী জেড-এর দিকে।

'আমরা এক ভিন্ন নক্ষত্রলোকের বাসিন্দা।' থ্রী জেড বলে, 'এই নক্ষত্রলোকে পৃথিবীর মত আরও অনেক গ্রহ আছে। আমরা অন্য গ্রহের সন্ধানে, যেখানে উন্নত প্রাণী আছে, সেখানে বারে বারে বার্তা পাঠাচ্ছিলুম। কিন্তু কেউ সে বার্তা গ্রহণ করেনি। অবশেষে, তোমাদের পৃথিবীর সাল হিসাবে ১৯৩০ সালের পাঠানো একটি বার্তা আমরা কয়েকদিন আগে পেয়েছি! আমাদের গ্রহে একটা সাড়া পড়ে যায় এই বার্তা পেয়ে। তা'হলে অন্য কোথাও উন্নত প্রাণী আছে। যে বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছাতে কত বছর লাগে, সেই বার্তা পাঠানো গ্রহটিকে দেখবার জন্য মাত্র সাতদিন আগে আমি আর ফরটি ওয়ান কিউ এই মহাকাশযান চেপে রওয়ানা হয়েছিলাম।

'পৃথিবীর কাছাকাছি আসার পর আমাদের কাছে কত-গুলি অদ্ভুত ব্যাপার ধরা পড়ল। পৃথিবী গ্রহ হলো তৃতীয় স্তরের বিজ্ঞান-ভিত্তিক সভ্যতা। এখনো হাজার বছর লাগবে একে প্রথম স্তরে আসতে। তাছাড়া এই গ্রহে আছে নোংরা জীবানু—যার ফলে এখানকার বাসিন্দারা অসুখে ভোগে। এদের মৃত্যু হয়, জন্ম হয়। কিন্তু সব থেকে খারাপ হলো—এই গ্রহে আছে বৈষম্য। মস্ত বড় বাড়ির পাশে গরীবদের কুঁড়ে ঘর। মহাকাশযানের পাশে গরুর গাড়ি। কোটি কোটি লোকের অভাব—যা এখনো দূর হয়নি। তাছাড়া আছে যুদ্ধ। নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে।

'আমার সঙ্গী ফরটি ওয়ান কিউ এমনিতেই ছিল একটু রাগী ধরনের। পৃথিবী গ্রহের এই বৈষম্য আর নিম্নস্তরের সভ্যতা দেখে সে ক্ষেপে গেল। ঠিক করল, যে রশ্মি দিয়ে ওকে আমি এড়িয়ে দিলুম, বর্দ্ধিত মাত্রায় ওই রশ্মি দিয়ে ও পৃথিবীকে পুড়িয়ে দেবে। এমন একটা বাজে গ্রহকে ধ্বংস করে দেবে। আমি অনেক বাধা দেবার চেষ্টা করলুম। শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে ওর যুদ্ধ বাঁধলো—যা আমাদের গ্রহে একেবারে অচল ওই যে যন্ত্রের পুতুলগুলি—ওরা রোবট। আমাদের হুকুমে চলে। ওরা আমার পক্ষে ছিল বলে বেঁচে গেলুম। কিন্তু ফরটি ওয়ান কিউকে মরতে হলো।'

থ্রী জেড এর কথাগুলি পল্টুর মাথায় ঢুকিল না। তার গ্রামে অথবা গ্রামের স্কুলে স্লেশ-শিপ, রোবট, নক্ষত্রমণ্ডলী, এ সব কথা কি-ই বা আলোচনা হয়। অতএব সে হা করে থ্রী জেড'এর কথা শুনে চলল।

'ফরটি ওয়ান কিউকে মেরে ফেলের জন্য', থ্রী জেড বলতে থাকে, 'আমার কোন দুঃখ নেই। আমি জানি এর জন্য আমার কঠিন শাস্তি হবে। তবু আমি সুখী, কেননা একটা গ্রহকে আমি বাঁচাতে পেরেছি। হোক না কেন সে গ্রহের সভ্যতা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এক সময় আমাদের গ্রহ-ও এই পর্যায়ের ছিল। কঠিন পরিশ্রম আর মস্তিস্কের উন্নতি ঘটিয়ে আমাদের উন্নত পর্যায়ে আসতে হয়েছে। পৃথিবীও একদিন আসবে।

'হ্যাঁ যা বলছিলুম। ফরটি ওয়ান কিউ-এর সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধের পর আমি জিতে গেলুম। কিন্তু স্লেশ-শিপ নিয়ন্ত্রণ হারাল। আছড়ে পড়ল পৃথিবীর বুকে। আর

এই গ্রামে পড়েছে বলেই রক্ষা। সহরে পড়লে না জানি কত ঝামেলা হতো। এখানে তোমার মত ভাল ছেলে, মাসির মত লোককে পেয়েছি। তুমি ও তোমার মাসির উপকার না পেয়ে হয়তো আমার মৃত্যু হয়ে যেত। যে ঝাঁকি আমার লেগেছে, পৃথিবীর প্রাণীর তা লাগলে সে এতক্ষণে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত।

পল্টু কোন কিছু বুঝল না। এটুকু তার মনে হলো—টাউদাও এই উড়োজাহাজ পৃথিবীর নয়। বলল, 'এবার উড়োজাহাজটা সারাবে না? আমি সাহায্য করব।'

থ্রী জেড ঘুরে ঘুরে মহাকাশযানের সমস্ত যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে লাগল। এক সময় তিনটে রোবট সবল হয়ে উঠে দাঁড়াল। তাদেরই একটি সে বিচিত্র ভাষায় কি আদেশ করতে রোবাট বাইরে বেরিয়ে এল। অকটা অদ্ভুত যন্ত্র হাতে থ্রী জেড বলল পল্টুকে, 'রোবট-টাকে তোমাদের জমি দেখিয়ে দাও।'

পল্টু, তার পিছনে কালু স্লেশ-শিপের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল—রোবট ওদের জন্য হাসিমুখে অপেক্ষা করছে। কালু একবার কুকুর সুলভ চীৎকার করতে যাচ্ছিল। কিন্তু পল্টু থামিয়ে দিল। কিন্তু ভারি অবাক হয়ে গেল, যখন রোবট বলে উঠল, 'সীমানা দেখিয়ে দিল পল্টুবাবু।'

'হুই যে শ্যাওড়া গাছ পুবদিকে—পশ্চিমে পকুরটা, দক্ষিণে এই আমি দাঁড়ালুম। আর কালু তুই ছুটে যা উত্তরে ওই ঢিবিটার কাছে। রোবটমশাই, এই আমাদের জমির সীমানা।'

সীমানা দেখিয়ে দেবার পর পাঁচ মিনিটও কাটলো না, রোবটটি তার অদ্ভুত যন্ত্র নিয়ে সীমানা বরাবয় প্রায় ছ'ফুট গভীর করে জমিটাকে ওলট পালট করে, আগাছা-ঘাস, টুকরো পাথর-টাথর একেবারে সাফ করে দিল। কালু কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করল রোবাটের সঙ্গে। তারপর পল্টুর কাছে ফিরে এসে লেজ নাড়তে নাড়তে আনন্দ প্রকাশ করল—যেন জমিটি তারই।

স্লেজ শিপ-এ ফিয়ে গেল রোবাট, সঙ্গে গেল পল্টু আর কালু। দেখল—থ্রী জেড পর্দা লাগানো যন্ত্রটার সামনে ঝুঁকে পড়েছে। দু'টি রোবট বিভিন্ন যন্ত্রের সামনে কাজ করে চলেছে ব্যস্তভাবে। তৃতীয়টি এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। থ্রী জেড যন্ত্র থেকে মুখ ঘুরিয়ে পল্টুকে বলল, 'এটাকে পৃথিবীর বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ট্র্যান্সমিশন সিস্টেম। স্লেজ-শিপ'এর সব কিছুই ঠিক আছে—এইটে ছাড়া। যন্ত্রটা ঠিক না করতে পারলে ও-এক্স গ্রহের স্টেশনে আমি খবর পাঠাতে পারছিনা এবং তাদের নির্দেশ মত মহাকাশে উড়তেও পারব না। ট্র্যান্সমিশনের সবই ঠিক আছে কিন্তু অ্যান্টেনা ভেঙ্গে গেছে। পল্টু, তোমাদের বাড়িতে অ্যালুমুনিয়মের কোন রড আছে?'

'রড?' পল্টু বলল, 'রড তো হবেনা। তবে মাসির রান্না করবার অ্যালুমুনিয়মের খুন্তি আছে।'

'খুন্তি? যাহোক, ওটা আনতে পারবে।'

'এগুনি কালুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই কালু, মাসির খুন্তিটা নিয়ে আয় চট করে।'

কালু তীরবেগে ছুটল। ওদিকে তাকিয়ে থ্রী জেড বলল, 'এগুলিকে তোমরা কুকুর বল—না? খুব বুদ্ধিমান প্রাণী। আমাদের গ্রহে নেই। ভাবছি যাবার সময় কালুকে নিয়ে যাব।'

'আমাকেও নিয়ে চলনা।' পল্টু বলল।

'তোমাকে নিয়ে যাবার অনেক অসুবিধা। পৃথিবীর পরিবেশ না হলে পৃথিবীর ওখানে থাকতে পারবে না। কালুর শরীরে ও ব্রেন-এ কয়েকটি পরিবর্তন করলে ও থাকতে পারবে। কিন্তু—।'

কালু ইতিমধ্যে ছুটতে ছুটতে ফিরে এসেছে। তার মুখে একটা অ্যালুমুনিয়মের খুন্তি। পিছন পিছন কালুকে বকতে বকতে মাসিও এসে হাজির। এসেই স্লেজ-শিপ'এর দিকে তাকিয়ে হা হয়ে গেল মাসি। বলল, 'ইরে বাবাঃ, এই তোমার উড়োজাহাজ! মহাশূন্য দিয়ে উড়তে উড়তে চলে এসেছ? আরে, আমাদের জমিটা এ ভাবে খুঁড়ল কে?'

এমন সময় সেই রোবট-টা লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝুকে প্রণাম করল মাসিকে। বলল, 'আমি গো মাসি।'

মাসি প্রথমটা চমকে গিয়েছিল। তারপর সামলে নিয়ে 'থাক বাবা থাক। আশীর্বাদ করি তোমাদের মঙ্গল হোক।'

থ্রীজেড অ্যালুমিনিয়মের মূর্তিটা নিয়ে স্লেজ-শিপের ছাদে চলে গিয়ে নেমে এল তক্ষুনি। তারপর ট্র্যান্সমিশন যন্ত্রের কয়েকটি সুইচ টিপতেই বিরাট পর্দায় ছবি ফুটে উঠল। পল্টু ও মাসি অবাক হয়ে দেখল—পর্দায় থ্রীজেড-এর মতই অনেক লোকের ছবি। একটা মস্তবড় ঘরে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সামনে তারা কাজ করছে। পর্দার সামনে এসে ভীড় করেছে সবাই। উত্তেজিত ভাবে বিচিত্র ভাষায় কি সব বলাবলি করছে। এরপর ওরা সবাই সরে দাঁড়ালে অন্য একজন এসে দাঁড়াল। একই রকম চেহারা, কিন্তু এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের জন্য পল্টুর মনে হল—এ বোধহয় এদের বড় কর্তা। থ্রী-জেড ও এই বড় কর্তার মধ্যে। অনেকক্ষণ

কথা হলো। পল্টু অথবা মাসি তার বিন্দু বিসর্গ বুঝল না।

অবশেষে সুইচ বন্ধ করে মাসি পল্টুর দিকে ফিরে বলল, থ্রীজেড। 'মাসি, আমার স্লেজ-সিপ ঠিক হয়ে গেছে। আমি এবার ফিরে যাব। তোমাদের উপকার আমি ভুলব না। এখন বল আমি তোমাদের জন্য কি করতে পারি। পোড়ো জমিটা চাষ করে দিলুম। পারলে ফসল ফলিয়ে নিও।'

'তুমি চলে যাবে টাউ বাবা।' আঁচলে চোখ মুছল মাসি। বলল, 'তুমি আর কি করবে বল। তোমাদের একটু যত্নআত্তি করতে পারলুম না। এই যা কষ্ট। ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে যাও এই আশীর্বাদ করি। তুমি থাকলে আমার বড় ভাল হতো। পল্টুটা লেখাপড়ায় ভাল না। তুমি পন্ডিত লোক। এখানে থাকলে ওকে একটু পড়াতে পারতে। আমার তো সাধ্যি নেই।'

'পল্টু খুব ভাল ছেলে।' থ্রী জেড বলল, 'ওর জন্য ভেবো না মাসি। পল্টু এদিকে এস।'

পল্টু এগিয়ে গেলে থ্রীজেড ওকে একটা অদ্ভুত চেয়ারে বসিয়ে মাথায় বেল্টের মত জড়িয়ে দিল। পল্টু অনুভব করল ওর মাথার ভিতর যেন সঙ্গীতের ধারা বয়ে চলেছে। খুব ভাল লাগছে তার। মনে হচ্ছে—অনেক দিনের জমাট বাধা বরফ গলছে। পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। একটু পরে বেল্ট সরিয়ে নিয়ে থ্রীজেড ওকে চেয়ার থেকে নামিয়ে দিল। পল্টুর এমন আনন্দ হতে লাগল যা সে কোনদিনই পায়নি।

'পৃথিবী মানুষের ব্রেন প্রায় সকলেরই ভাল।' থ্রীজেড বলল, 'তবে বিবর্তনের ধারায় এক জায়গায় থেমে আছে। পল্টুর ব্রেনের কয়েকটা ঘুমন্ত সেল জাগিয়ে দিলুম। এবার থেকেও লেখাপড়ায় এত ভাল হবে যে কেউ ওর মনে পারবে না।'

ট্রান্সমিশন সঙ্গে হঠাৎ শুরু হল ধ্বনি তরঙ্গ। থ্রীজেড মঞ্চে ঝুঁকে পড়ল। বিচিত্র শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল। স্লেজ-শিপের অভ্যন্তর। রোবটগুলি ব্যস্ত হয়ে পড়ল বিভিন্ন কাজে। থ্রী জেড ওদের সামনে ফিরে এল। ওর মুখ বিষণ্ণ। বলল, 'মাসি, পল্টু, এবার চলে যাবার ডাক এসেছে। আমি যাচ্ছি। হয়তো আবার কোনদিন আসব। তোমাদের কথা কখনো ভুলব না। আর ভুলব না মাসির খুন্তি। ওটা আমার সঙ্গেই যাচ্ছে। ওটুকু না পেলে আমি কোন কাজই করতে পারতুম না। এবার তোমরা নেমে যাও।'

মাসি, পল্টু ও কালু নেমে এল স্লেশ-শিপ থেকে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হল গুন গুন শব্দ। চারিদিকে ঝড়ের হাওয়া। কালু ভৌ ভৌ করে ডাকতে শুরু করেছে। এত হাওয়ার বেগে পল্টু চোখ বন্ধ করে জড়িয়ে রইল মাসিকে। এক সেকেন্ড পার না হতেই টাউ নক্ষত্রলোকের এক্স গ্রহের মহাকাশযান নীল আকাশে মিলিয়ে গেল। পড়ে রইল কিছু পোড়া ঘাস।

বাড়ি ফেরার পথ ধরল মাসি, পল্টু আর কালু। চোখের জল মুছতে মুছতে মাসি বলল, 'ঠাকুর, ঠাকুর, টাউ যেন ভালয় ভালয় দেখো পৌছে যায়। হ্যারে পল্টু ওদের মত ওখানে ডাকবর নেই? একটা পোস্টকার্ড লিখে পৌছে সংবাদ দিতে পারবে না?'

পল্টু হাসল। ওর চোখে মুখে বুদ্ধির ঝলক। বলল, 'না, ওদের কোনরকম নেই মাসি।

অঙ্কের ভেল্কি

□ শান্তি নন্দী

এমন এমন সংখ্যা আছে যাহা গুণ না করে গুণফল বলা যায়। যেমন ঃ

ফল,

৯৯ × ১৮ = ১৭৮২ ৯৯ × ৩৬ = ৩৫৬৪

৯৯ × ৪৫ = ৪৪৫৫ ৯৯ × ৫৪ = ৫৩৪৬

৯৯ × ৬৩ = ৬২৩৭ ৯৯ × ৮১ = ৮২১৯

৯৯ × ৯ = ৮৯১০

প্রথম অঙ্কটি ১৮ কে উল্টোলে হয় ৮১, ৮১-এর সঙ্গে ১ যোগ করলে হয় ৮২, তা গুণফলের ডান দিকে বসানো হল। ১৮ থেকে ১ বিয়োগ করলে হয় ১৭, তা ৮২-এর আগে বসানো হল। এ নিয়মে আমরা পরেরগুলি বের করতে পারব।

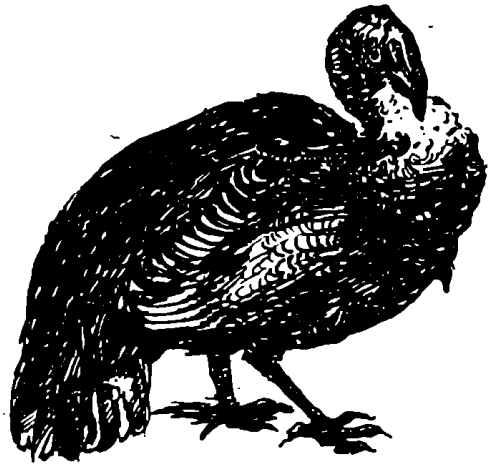

সাইবেরিয়ার পাখী

মধুসূদন পাল

আজ তোমাদের সাইবেরিয়ার কয়েকটা পাখীর কথা শোনাবো। এ অঞ্চলের পাখীর কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে বিটার্নের কথা।

রিটার্ণ হলো সারস জাতের এক পাখী। দেখতে কদাকার। লম্বা লম্বা পা—কালো রঙের। চোখ দুটো হলদে। ঠোঁট খুব সরু আর ধারালো। ছাইরচা হলদে গোছের এদের ল্যাজ। ডানা দুটো শরীরের তুলনায় খুব লম্বা। মোটের উপর দেহে এতটুকু শ্রী নেই। খালবিলের ধারে ঘাস অথবা শরের বনে বাস করে।

বিটার্ণ খুব চালাক পাখী। ছোট ছোট পাখীগুলোর পিছনে সর্বদা লেগেই আছে। দেখলেই তাড়া করে। মানুষ দেখলেই এরা চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।—ঠিক যেন আকাশের শোভা দেখছে। কোন বিপদের আশংকা বুঝলেই এরা শর বনে চুপচাপ গলাটি উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, নয়তো বড় বড় ঘাসের বনে লুকিয়ে পড়ে। আর গায়ের রঙও ঠিক মিলে যায় ঘাসের রঙের সঙ্গে। বোঝাই যায় না যে ওটা একটা পাখী।

ক্যারলিউ এ-অঞ্চলের অপর একটি পাখী। এরা খুব দ্রুত উড়তে পারে। উড়তে উড়তে এরা নানা রকমের ভঙ্গী করে। কখনও দ্রুতগতিতে ডিগবাজি খেতে খেতে নীচের দিকে নেমে আসে, আবার কখনো শোঁ শোঁ শব্দে উপরের দিকে উঠে যায়। আকাশের কোলে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে ক্যারলিউ পাখী উড়ে চলে, তখন দূর থেকে দেখতে খুব মজা লাগে।

আবার এখানকার কুট পাখীর স্বভাব ঝতকটা বিটার্ণের মতো। ঘাস এবং শরের বনে এদের দেখা যায়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ডালেই বাস করে। এদের ঠোঁট খুব তীক্ষ্ণ। ডানা এবং পা শরীরের তুলনায় বেশ বড় বড়। ওড়বার সময় ঝটপট শব্দ হয়। পাখী হলে কি হয়, ওড়ার ব্যাপারে এরা তত পটু নয়। উড়ন্ত অবস্থায় দেখলে মনে হয় খুব ক্লান্ত ও অসহায়। যেন সবেমাত্র উড়তে শিখে।

সাইবেরিয়ার আর এক পাখীর নাম গ্যাল। এদের শরীর খুব সুঠাম। দেখতেও বেশ সুন্দর। এরা খুব ভাল উড়তে পারে। উড়তে উড়তে এরা আকাশের অনেক উপরে উপরে উঠে যায়, আর নীচে থেকে দেখলে মনে হয় যেন উজ্জল সব নক্ষত্র আকাশে চলে বেড়াচ্ছে।

ধারাবাহিক উপন্যাস

[আগের কথা ঃ মানবজাতিকে বাঁচাতে, টারজনের সাহায্যের প্রত্যাশায় এসেছে ২২৬০ সাল থেকে বোরোভিয়াক। পৃথিবীর রক্ষাকবচ চারটি চাবি আছে ইলেকট্রনিক ভল্টে। প্রথম অভিযানে সাক্ষাৎ হল গুহাবাসী গুণ্ডয়ের সঙ্গে। সেখান থেকে বুদ্ধি করে ছিনিয়ে নিয়ে এল আশ্চর্য দ্যুতি সম্পন্ন এক পাথর। তারপর……তারপর টারজর সময় ফটক থেকে বেরুতেই মুখোমুখি হল গ্রীক সভ্যতার। এবং সম্রাট টাইটাসের সেনাপতির আস্তাবলে মাথা গোঁজার স্থান ফেল টারজন।]

যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে শুধু একটা হাত সামনে বাড়িয়ে দেয় টারজন। লৌহমুষ্টিতে চেপে ধরে আততায়ীর গলা। ঐভাবেই গলা ধরে তাকে শূণ্যে ঝুলিয়ে রেখে তাকায় মেয়েটির দিকে।

কব্জিবন্ধে গুন্‌গুন্‌ শব্দ জাগছে।

চকিতে পেছিয়ে যায় টারজন। চাবি রয়েছে রত্নপেটিকার মধ্যে—কিন্তু এখন তা নেওয়ার সময় নয়।

মেয়েটিই দৌড়ে এসে টারজনের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে ফুঁপিয়ে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে টারজন। কি বিপদ। আপাততঃ চম্পট দিয়ে পরে যে ফিরে আসবে, ভরাতুরা মেয়েটা সে পথও যে দিল বন্ধ করে!

অলিন্দ-প্রান্তে আবির্ভূত হয়েছে সশস্ত্র একদল পুরুষ—পুরোধা ব্যক্তি বেশ বয়স্ক। সম্ভ্রান্ত আকৃতি। মাথার চুল সাদা। নৈশ পায়জামা চামড়ার হাঁটু পর্যন্ত বুটের মধ্যে গোঁজা। হাতে খোলা তলোয়ার। চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি।

দৌড়ে এসে হেঁকে ওঠে তীব্রকণ্ঠে—জাসটিন। এসব কি হচ্ছে এখানে?'

টারজনকে ছেড়ে সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের দিকে দৌড়ে যায় মেয়েটি।

আততায়ীদের দেখিয়ে বলে—'ওরা গায়েব করে নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে—সেই সঙ্গে আমার গয়নার বাক্স। কিন্তু ইনি, আমাকে বাঁচিয়েছেন!'

সশস্ত্র পুরুষরা ছুটে এসে আততায়ী তিনজনকে পাকড়াও করে নিয়ে যায় টানতে টানতে। কাছে এগিয়ে আসে জাসটিনের বাবা।

নির্নিমেষে দেখে টারজনকে—'কে আপনি? ঢুকলেন কি করে?'

'টারজন আমার নাম। পাঁচিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, এরা পাঁচিল টপকাচ্ছে। তাই পেছন নিয়েছিলাম।'

'শান্ত্রীদের চোখ এড়িয়ে কেল্লায় ঢুকলেন কি করে?'

'যেভাবে ওরা ঢুকেছে।'

ঈষৎ হতভম্ব সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ। মেয়েটি এগিয়ে আসে এক পা।

'বাবা! এখন কি জেরা করার সময়? টারজন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, সেটাই কি যথেষ্ট নয়? তোমার ঘুম দরকার। টারজনেরও রাত কাটানোর জন্যে একটা ঘর দরকার। জিজ্ঞাসাবাদ কাল সকালে করলেই তো হয়। সেই সঙ্গে পারিতোষিক দেওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে কিন্তু।'

ক্ষনিক ভেবে নিয়ে মাথা হেলিয়ে সায় দেয় বৃদ্ধ। হাতছানি দিয়ে ডাকে একজন অনুচরকে। ইসারা করতেই টারজনকে নিয়ে সে অগ্রসর হয় অলিন্দ পথে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বনের রাজা, জাসটিন হাসি মুখে চেয়ে আছে তার দিকে।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠছে টারজন। এমন সময়ে কানে ভেসে আসে নতুন গোলমাল।

'হুজুর! আততায়ীরা উধাও হয়েছে।'

গর্জে ওঠে বৃদ্ধ—'কি হয়েছে?'

'উঠোনের ঠিক মাঝখানে গিয়েই তিনজনেই একসঙ্গে বাতাসে মিলিয়ে গেছে।'

'ভৌতিক ব্যাপার নাকি?' ঠকঠক করে কেঁপে ওঠে টারজনের সঙ্গী।

টারজন কিন্তু অবাক হয়নি। অনেক অসাধারণ ব্যাপারই ঘটছে এবং ঘটবে। প্রস্তুত হয়েই তো সময়-পথের পথিক হয়েছে বনের রাজা। হঠাৎ যারা বাতাসে মিলিয়ে যায়, তারাও নিশ্চই সময়-পর্যটক—এসেছিল একই উদ্দেশ্য নিয়ে—চাবিকাঠির সন্ধানে।

ভোরের সূর্যকিরণে ঘুম ভাঙে টারজনের। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। ফ্রান্স অথবা জার্মানীর কোথাও পৌঁছেছে নিশ্চয়। জাসটিনের ঢাকা নতুন এক প্রস্থ পোশাক পাঠিয়ে দিয়েছে তার জন্যে। চামড়ার পা-জামা, বুট আর পুরু সুতীর ইউনিফর্ম। শীত জয় করা যাবে। ঘুরতে ফিরতেও সুবিধে হবে—কৌপীনপরা বিশাল দেহীকে দেখে আর কেউ হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে না।

চাবির সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু জাসটিনের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া তো যায় না—সময়-ফটক খুলে যাওয়ার আগেই কেল্লার শান্ত্রীরা ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। মাথা ঠাণ্ডা করে ফন্দী আঁটতে হবে। সেই কারণে কেল্লার কোথায় কি আছে, আরো জানা দরকার।

দরজাটা ফাঁক করে অলিন্দ পথে তীক্ষ্ণ-চাহনি মেলে ধরে টারজন।

জাসটিন আসছে তার দিকে। মুখে মৃদু হাসি।

আচমকা গুনগুন শব্দ জাগে কব্জিবন্ধে!

আরে গেল যা! চাবি রয়েছে তাহলে এবার জাসটিনের—নিশ্চয় ঐ কণ্ঠহারটার মধ্যে। এইরকম ভুতুড়ে আওয়াজ শুনলে তো ভিরমি যাবে মেয়েটা। তাড়াতাড়ি হাতের কব্জিবন্ধ খুলে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দেয় টারজন।

বেরিয়ে আসে বাইরে। মুখোমুখি হয় দুজনে। রাতের অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানায় জাসটিন। টারজনকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় নিচের তলায় বড় হলঘরে। বিশাল লম্বা বেঞ্চি-টেবিলে বসে বাদামী রঙের রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল জাসটিনের বাবা লিওপোল্ড। টারজনকে দেখেই আর এক প্রস্থ সাধুবাদ জানিয়ে কিছু সোনা উপহার দিতে চায় পুরস্কার স্বরূপ।

কিন্তু সোনা তো চায় না বনের রাজা। হাঁটু গেড়ে বসে বলে সবিনয়ে, সে ভবঘুরে। থাকবার ঠাঁই পেলেই ধন্য মনে করবে। এই কেল্লায় নাহয় একটা কাজ কি পাওয়া যাবে না?

নিশ্চয় পাওয়া যাবে। সোল্লাসে বলে জাসটিন—'টারজন হোক আমার বডিগার্ড!'

মৃদুহাসে লিওপোল্ড। জাসটিনের ইচ্ছেয় তার কোনো আপত্তিই নেই। বডিগার্ডই হোক টারজন। কিন্তু দিন কয়েক পরেই এসে পৌঁছেছে অ্যালড্রেস্স-য়ের রবার্ট তাকে বিয়ে করার জন্যে। জামাই যদি বডিগার্ড বরখাস্ত করে দেয়, তার কিছু বলার নেই।

জাসটিনের মুখ শুকিয়ে যায়। টারজন কিন্তু মনে মনে ঠিক করে রেখেছে চাবি না ছাড়ানো পর্যন্ত জাসটিনের সঙ্গ ত্যাগ করবে না কিছুতেই।

দিন দুয়েক কাটল জাসটিনের সঙ্গে মৃগয়া অভিযান

এবং অশ্বারোহণের আনন্দে। কণ্ঠহার অপহরণের সুযোগ কিন্তু পাওয়া গেল না। চোরের মত রাতবিরেতে চুরি করার ইচ্ছেও তো নেই টারজনের।

তৃতীয় দিনে এল অ্যানড্রেন্স-য়ের রবার্ট—দলবল নিয়ে। সাঙ্গপাঙ্গকে বাইরের উঠোনে দেখে একা ঢুকল হলঘরে। লিওপোল্ডের সামনে নতজানু হয়ে বসে বাগাড়ম্বর করার সময়ে ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল গায়ের শৃঙ্খল-বর্ম। টারজনের সে-সব কানে গেল না। তার চোখ তখন রবার্টের মুখের দিকে। লম্বা সোনালী চুল, শীর্ণ দুর্বল মুখ, দীর্ঘ পলকাবপু। এ-ধরণের পুরুষ যে এর আগেও দেখেছে টারজন। অবিকল বোরোভিয়াকের মতোই···

উঠে দাঁড়িয়েছে রবার্ট। সঙ্গে সঙ্গে শোনালেন অদ্ভুত সেই গুঞ্জনধ্বনি।

বটে। তাহলে চাবিকাঠির সন্ধানে আসা হয়েছে দূর ভবিষ্যত থেকে। টারজনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাবি নিয়ে যাবে। ক'দিন আগে নিশুতি রাতে আততায়ীদের সহসা শূন্যে বিলীন হওয়ার পেছনেও রয়েছে দূর-ভবিষ্যতের উন্নত বিজ্ঞান!

সতর্ক হয় টারজন।

গুঞ্জনধ্বনি হুঁশিয়ার করে তুলেছে রবার্টকেও। একজন যোদ্ধা-স্যাঙাৎ এগিয়ে আসে সামনে একখানা কালো বাক্স নিয়ে। হাতবাড়িয়ে বাক্সটা হাতে নেওয়ার ফাঁকে সুকৌশলে নিবন্ধ থেকে কব্জিবন্ধ খুলে ম্যাচাতের হাতে পাচার করে দেয় রবার্ট।

টারজনের চোখ এড়ায় না কিছুই।

কালো বাক্স হাতে এবার জাসটিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ববার্ট—তুলে দেয় জাসটিনের হাতে। ভেতরে একটা ভারী সোনার আংটি। উৎফুল্ল মুখে টারজনের পানে তাকায় জাসটিন।

সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি অনুসরণ করে টারজনকে দেখেই যেন জ্বলে ওঠে—রবার্ট—'এ আবার কে?' বলেই হাত দেয় কোমরের তরবারিতে।

মৃদু হেসে রবার্টের কাঁধে হাত রেখে তাকে শান্ত করে লিওপোল্ড।

টারজন জাসটিনের বডিগার্ড। ও'র জন্যেই ক'দিন আগে গয়নার বাক্স সমেত গায়েব হয়ে যায়নি জাসটিন।'

বিষদৃষ্টি ছেড়ে রবার্ট ঘুরে দাড়ায় লিওপোল্ডের দিকে।

বলে উদ্ধত কণ্ঠে—'আমার কিন্তু আজকে বিয়ে করার একদম সময় নেই। জরুরী কাজে এখুনি যেতে হবে লোরেন। যাওয়ার আগে জাসটিনের একটা স্মারকচিহ্ন সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। কণ্ঠহারটা—'।

অপাঙ্গে টারজনের অনুমতির জন্যে তাকায় জাসটিন—এই কদিনেই নিবিড় বন্ধুত্ব জন্মেছে দুজনের মধ্যে। খুব আস্তে মাথা হেলিয়ে বারণ করে টারজন।

কিন্তু ধূর্ত রবার্টের সতর্ক চাহনিতে ঐটুকু মাথা হেলালেও অগোচর থাকে না। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে লাফিয়ে গিয়ে দাড়ায় টারজনের সামনে। হাতের দস্তানা খুলে আছড়ে ফেলে মেঝেতে।

চেঁচিয়ে ওঠে অসভ্যের মত গলার শির তুলে—'ছিঃ ছিঃ। এসেছি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েকে বিয়ে করতে—কিন্তু তার সঙ্গে একটা নোংরা ইতর লোকের এক বন্ধুত্ব। এর শেষ না দেখে আমি যাবো না!'

ভাবী-জামাইয়ের একি আচরণ! এত রগচটা স্বভাব তো ভাল নয়। অসন্তুষ্ট হয় লিওপোল্ড।

রবার্ট তখনো চেঁচিয়ে চলেছে ষাঁড়ের মত গাফ গাক করে—'ভাবী বউকে জয় করে নিয়ে যাবো এই নীচ লোকটার খপ্পর থেকে।'

অর্থাৎ দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান!

লিওপোল্ডের ভ্যাবাচাকা চাহনির সামনেই মেঝে থেকে দস্তানা কুড়িয়ে নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে টারজন। বিশালবাহুর সুপুষ্ট পেশী দেখে চমৎকৃত হয় লিওলোল্ড। রবার্ট নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছে। বিশালাকৃতি ঐ বডিগার্ডের সঙ্গে তালপাতার সেপাই রবার্ট! ছোঃ!

'টারজন।' মৃদুকণ্ঠে বলে লিওপোল্ড—'দ্বন্দ্বযুদ্ধে জিতলে কি পুরস্কার নেবেন বলুন।'

'কণ্ঠহারটা।' অম্লানবদনে বলে টারজন।

লিওপোল্ডের দুই চোখে কৌতুক নেচে ওঠে। সামান্য একটা কণ্ঠহারের জন্যে মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে চলেছে দুজন পুরুষ!

সবুজ মাঠ ঝকঝক করছে প্রখর রোদে। ঘোড়ায় চেপে হাজির হয়েছে টারজন, রবার্ট, লিওপোল্ড এবং জাসটিন।

টারজনের অঙ্গে কিন্তু জঙ্গলের বেশ—কোমরে পশুচর্মের কৌপিন ছাড়া কিস্সু নেই। ভারী বর্ম গায়ে থাকলে চটপট লড়াই করা যায় না। তাই সবাইকে অবাক করে দিয়ে নগ্নগায়ে উঠে বসেছে ঘোড়ায়। কোমরে কেবল একটা তরবারি, হাতে বর্শা আর ঢাল।

রবার্ট কি যেন বলতে গেছিল টারজনকে, কিন্তু তার

আগেই লিওপোল্ডের সংকেতে সুরু হয়ে গেল লড়াই। মাঠের অন্য প্রান্তে ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটে গেল টারজন। আরেক প্রান্ত থেকে তার দিকে হেলিয়ে পড়া চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তৈরী হল রবার্টও।

ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে মুখোমুখি সংঘাতের জন্যে বায়ুবেগে ছুটে আসছে দুই দ্বন্দ্বযোদ্ধা। টারজনের ঢালের আড়ালে উদ্যত রয়েছে বর্শা।

সামনাসামনি এসেই কিন্তু পলকের মধ্যে টারজনকে পাশ কাটিয়ে যায় রবার্ট। বাঁ-পাশ দিয়ে ঘোড়া নিয়ে বেকে যাওয়ার সময়ে একটা অদৃশ্য ধাক্কায় ঘোড়া থেকে পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নেয় টারজন। ঘোড়া কিছুদূর ছুটে যেতেই তাকায় ঢালের দিকে। এককোণে একটা ছোট্ট ফুটো—ধোঁয়া উঠছে ফুটো থেকে!

ভবিষ্যতের চাবি-সন্ধানী তাহলে যুদ্ধের কোনো নীতি মানতেই রাজী নয়! ছলেবলে কৌশলে চাবি হস্তগত করাই তার অভিপ্রায়। সুপার-হাতিয়ার টারজনের নেই—আছে কেবল বর্শা, ঢাল আর অরণ্য-মানবের ধূর্ততা···

ঘোড়া নিয়ে আবার ছুটে যায় রবার্টের দিকে—এবার আস্তে। কাছাকাছি আসতেই আবার যেই পাশের দিকে গিয়ে অস্ত্র তুলেছে রবার্ট, চোখের পলক ফেলার আগেই সেইদিকেই ঘুরে গিয়ে অস্ত্র হানার সুযোগ না দিয়েই হাতের বর্শা দিয়ে প্রচন্ড আঘাত হানে টারজন—ঘোড়া থেকে ছিটকে গিয়ে ঘাসজমিতে আছড়ে পড়ে রবার্ট।

ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে রবার্টের সামনে পৌঁছোয় টারজন। ভারীবর্ম গায়ে রবার্ট তখনো উঠে দাঁড়াতে পারেনি। তলোয়ারের এক কোপে গলার কাছে শৃঙ্খল-বর্ম ফর্দাফাঁই করে কণ্ঠনালীর ওপর ফলা চেপে ধরে টারজন—আরেক হাতে লেজার-পিস্তল কেড়ে নিয়ে পায়ের গোড়ালি দিয়ে দফরফা করে দেয় মারণাস্ত্রের।

লিওপোল্ড ইসারা করছে। যুদ্ধে জিৎ হয়েছে তার। এগিয়ে যায় টারজন সেইদিকে। কণ্ঠহার বাড়িয়ে ধরেছে জাসটিন। মুখে হাসি।

কব্জিবন্ধেও শোনা যাচ্ছে গুনগুন ধ্বনি।

'সময় কম'—দ্রুত বলে টারজন—'এখুনি যেতে হবে আমাকে।'

মুখ শুকিয়ে যায় বাবা এবং মেয়ের।

আমতা আমতা করে বলে লিওপোল্ড—'আমার মেয়ের ইচ্ছে আপনাকে একটা ইংলিশ লম্বা ধনুক উপহার দেবে—আপনাকেই মানাবে ভালো। দুনিয়ায় ঢুঁড়লেও এত ভালো ধনুক আর পাবেন না।'

অসহিষ্ণু টারজন তূণভর্তি তীর আর লম্বা ধনুকটা হাত বাড়িয়ে নেয় বটে, কিন্তু ভেবে পায়না পরবর্তী যুগের অভিযানে এ ধনুক আদৌ কোনো কাজে আসবে কিনা।

কণ্ঠহার নিয়ে দৌড়ে যায় একটু তফাতে। কব্জিবন্ধে ছোঁয়াতেই শূণ্যপথে ঘাসজমির ওপর আবির্ভূত হয় জাজ্বল্যমান সময় তোরণ—পাশাপাশি দুটো।

রবার্ট পড়ি কি মরি করে দৌড়ে আসছে তার দিকে—'টারজন, শোনো! চাবি নিয়ে যেও না। বোয়েভিয়াক আসলে—'

বাঁদিকের তোরন পথে কণ্ঠহার নিক্ষেপ করে ডানদিকের ফটকে লম্বা লাফ মেরে ঢুকে যায় টারজন।

জাসটিন এবং সবার চোখের সামনে মিলিয়ে যায় বাতাসে।

পাঁচ : মন্সয়ের ধনুকধারী

যুদ্ধক্ষেত্রে বোমা ফাটছে, গুলি ছুঁটছে, আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে, বুনোধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে।

টারজন এসে পড়ছে একটা ট্রেঞ্চের ভেতরে। সামনের কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দৌড়ে আসছে বেয়নেটধারী একদল জার্মান সৈন্য।

টারজন রয়েছে তাহলে বৃটিশদের ট্রেঞ্চে। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু বাড়ী থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে এবং পঞ্চাশ বছর আগে জার্মান বুলেটে নিহত হওয়ার তার কোনো বাসনাই নেই।

তাই তুলে নিল ধনুক। নির্ভুল লক্ষ্যে মাটিতে শুইয়ে দিল পর-পর কয়েকজন জার্মান শত্রুসৈন্যদের। থমকে গেল বাকী সকলে। কোত্থেকে আসছে তীর?

ক্ষেপে গেছে অফিসার। রিভলবার উঁচিয়ে তাড়া দিয়ে ঠেলে আনছে ভ্যাবাচাকা সৈন্যদের।

নিরুপায় টারজন এবার তীরবিদ্ধ করে অফিসারকে। হুকুম দেওয়ার মত আর কেউ না থাকায় হতভম্ব সৈন্যরা চোঁ-চাঁ দৌড়মারে পেছন ফিরে।

জয়ধ্বনি শোনা যায় টারজনের পাশেই—ট্রেঞ্চের মধ্যে। এতক্ষণ বেশ কয়েকজন বৃটিশ সৈন্য ভয়ে কাঁপছিল আগুয়ান জার্মানদের দেখে। এবার সাহস ফিরে পেয়েছে।

[চলবে]

[১৮ পাতার পরের অংশ]

আবার আমাকে তোমরা তুলে এন। আমি তখন আমিই থাকব।

ডঃ চট্টরাজ শিউরে উঠলেন। পিন্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সে নিষেধ করছে না। পুকুরের সমস্ত ভাইরাস যদি এই ভাইরাসের জ্ঞান লাভ করতে পারে তাহলে পৃথিবীর জীবকুল ধ্বংস হতে আর কতক্ষণ। ডঃ চট্টরাজ বললেন, না। তা হয় না। তুমি বরং এখানেই থাক। তোমাকে সারা জীবন আমরা বই পড়ে শোনাব।

ভাইরাস গুম হয়ে গেল। তারপর বলল, বেশ শোন, আমি যদি তোমাদের লোহাকে সোনা করার বিদ্যে শিখিয়ে দিই, তবে কি···।

পিন্টুর কাকু অনিল বসুরায় চিৎকার করে উঠল, সোনা তৈরি করার বিদ্যে শেখাবে। তাহলে আমি রাজি তোমার শর্তে।

না। পিন্টু চিৎকার করে উঠল। না। ভাইরাস তুমি সোনার লোভ দেখাবে না। তোমার মতলব মোটেই ভাল নয়।

আঃ পিন্টু। তুমি থাম। ছোট ছোটর মতো থাক। ভাইরাস বিরক্তি প্রকাশ করল।

হ্যাঁ, পিন্টু। তুমি এখান থেকে যাও। অনিল বসুরায় বললেন।

কারণ, ভাইরাস ফাঁদ পেতেছে। পৃথিবীর সর্বনাশ হয়ে যাবে। ফাঁদে পা দিও না তোমরা।

ইতঃস্তত করে ডঃ চট্টরাজ বললেন, না। সরকারের লাইসেন্স নিয়ে সোনা তৈরী করতে অসুবিধা কোথায়? আমরা রাজী।

খুশি শোনাল ভাইরাসের গলা। বেশ, তোমাদের পরমানু তত্ব আমাকে পড়ে শোনাবার ব্যবস্থা কর। আমি যেভাবে বলব সেভাবে একটা যন্ত্র তৈরি করে নেবে তোমরা।

পিন্টু বলল ভাইরাস তুমি মরবে। তোমার কাছে বিদ্যে শিখে নিয়ে ওরা তোমাকে হত্যা করবে।

ডঃ চট্টরাজ ধমক দিয়ে উঠলেন, পিন্টু তুমি এখান থেকে যাও। তারপর ভাইরাসকে বললেন, হত্যা করব কেন? কথা যখন দিয়েছি তার নড়চড় হবে না।

ভাইরাস বলল, বেশ, আমি তৈয়ি।

পিন্টু রাগে দুঃখে ল্যাবরেটরি ছেড়ে চলে গেল।

পিন্টুর রাগ পড়েছে। কাকা বললেন, চল পিন্টু। ভাইরাস তোকে ডেকেছে। আজই সোনা তৈরি করাটা সে শিখিয়ে দেবে।

কদিন ভাইরাসের সঙ্গে কথা না বলে পিন্টুর মন খারাপ হয়েছিল। তাছাড়া স্কুলে কঠিন কটা সমীকরণ দিয়েছিল। করতে পারেনি সে।

কাকা আর পিন্টু ভাইরাসের ঘরে ঢুকে হতবাক। ঘর ফাঁকা, জার নেই। যন্ত্রপাতিও নেই। অনিল বসুরায়ের পাত্তাও নেই। বুঝতে কারও বাকি রইল না। ডঃ অনিল বসুরায় সব কিছু চুরি করে পালিয়েছেন একা সোনা তৈরি করার বিদ্যে আয়ত্ত করায় জন্যে।

পিন্টু বলল, সে না হয় হল। কিন্তু ওরা তো কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। অনিলকাকুকে যদি ভাইরাস মেরে ফেলে, বা অনিলকাকু ঐ ভাইরাসকে মেরে ফেলেন।

পিন্টুর কথামতো ঠিক হল ঠিক সন্ধ্যের সময় ঐ নোনা পুকুরের পাড়ে হাজির হতে হবে। অনিল কাকু নিশ্চয় অন্ধকারের সুযোগ নিতে চাইবেন। দিনের আলোয় লোক জানাজানি হয়ে যাবে।

বিকেল থেকে ঝোড়ো হাওয়া বইছে প্রবলভাবে।

সন্ধ্যের অন্ধকারে পুকুর থেকে কিছু দূরে রাস্তায় ওপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে পিন্টুকে সঙ্গে করে টর্চহাতে ডঃ চট্টরাজ ক্লান্তদেহে রাস্তায় পা দিলেন। রাস্তা থেকে পুকুর পাড় পর্যন্ত জায়গাটা ঝোপঝাড়, গাছ-গাছালিতে ভর্তি। তারা দুজন অন্ধকারেই এগিয়ে চললেন। কিছুটা এগোতেই দেখা গেল একটা হ্যাজাক বাতি জ্বলছে। যন্ত্রটার সামনে উবু হয়ে বসে পিন্টুর অনিলবাবু হাতের একটা কী জিনিষ হ্যাজাকের আলোয় দেখছেন।

তার সামনে ভাইরাসের জারটা। দুজনে থমকে দাঁড়াল একটা গাছের আড়ালে। বাতাসের

শনশন শব্দ ছাপিয়েও ডঃ অনিল বসুরায়ের উল্লাসধ্বনি শোনা গেল। সোনা! সোনা! সোনা! দুএক মুহূর্তের পরই তারা দেখলে পকেট থেকে কিছু একটা বার করলেন ডঃ বসুরায়। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জার থেকেই শুঁড়ের মতো কিছু একটা বেরিয়ে এসে তার কব্জি চেপে ধরল। ডঃ বসুরায় আতঙ্কে, যন্ত্রনায় চিৎকার করে উঠলেন, আমায় ছেড়ে দাও! সোনা চাই না! চাই না।

উত্তেজনায় কাঁপছিলেন ডঃ চট্টরাজ। পিন্টু তাড়াতাড়ি কিন্তু দুজনে দৌড়তে গিয়ে অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। আর সেই মুহূর্তে তাদের কানে একটা শব্দ ভেসে এল, ঝপাৎ! সর্বনাশ, ভাইরাস পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছে।

আতঙ্কে নীল হয়ে দুজনে যখন পাড়ের কাছে পৌঁছল, দেখা গেল সবই রয়েছে, নেই শুধু ভাইরাস আর ডঃ বসুরায়।

ভয়ার্ত স্বরে ডঃ চট্টরাজ বলে উঠলেন, ও অনিলকে শেষ করে ফেলেছে। শয়তান, অনিলকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। অনিলবাবু ভাইরাসকে হত্যা করতে গিয়েছিল, ঐ দেখ কার্বোলিক এ্যাসিডের শিশি, ভাইরাস কথা রেখেছিল, ঐ দেখ সোনার টুকরো। সত্যিই এক টুকরো সোনা অন্ধকারেও চকচক করছে।

হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় পুকুরের একটা নীচু পাড়ের দিকে ডঃ চট্টরাজের দৃষ্টি পড়তেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন পাগলের মতো, পিন্টু, পালা। পালা, ঐ দেখ।

আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে জোরালো টর্চের আলোয় পিন্টু যা দেখল তাতে আতঙ্কে হিম হয়ে এল ওর শরীর। ঝড়ের দাপটে পুকুরের জলে বড় বড় ঢেউ জাগছে, আর তা আছড়িয়ে পড়ছে গায়ে। ছিটকিয়ে যেটুকু জল পাড়ের ওপরে পড়ছে তা থেকে জন্ম নিচ্ছে হাজার হাজার শুঁড়ওলা সেই জেলি ফিস। ভাইরাস পুকুরের সবাইকে বিবর্তনের বিদ্যা মুহূর্তে শিখিয়ে দিয়েছে। তারা এখন মাটির ওপর দিয়ে সৈন্যবাহিনীর মতো যাত্রা শুরু করছে।

পিন্টু আর ডঃ চট্টরাজ উন্মাদের মতো পড়ি মরি করে ছুটে গিয়ে গাড়িতে বসলেন। পিন্টু বলল, অনিলকাকুর লোভের জন্যে এবার পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। কাকা, সবাইকে সাবধান করতে হবে। কর্বোলিক এ্যাসিড স্প্রে করে ওদের মারতে হবে এক্ষুণি।

কাজটা যত সহজ হবে ভাবা গিয়েছিল তত সহজ হল না। প্রত্যক্ষ ধ্বংসলীলা না দেখার আগে কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে চাইলেন না। কিন্তু যখন বিশ্বাস করলেন, ততক্ষণে হাজার হাজার মানুষ, পশু মারা গেছে। ভাইরাসবাহিনীর গতিপথের সমস্ত গ্রাম জনপদ ভয়ে জনশূন্য হয়ে যেতে থাকল। তবে একটা ব্যাপার বোঝা গেল যে ওরা একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছে। এটা আরও ভয়ংকর ব্যাপার। একটা জেলি ফিসও যদি সমুদ্রের জলে নামতে পারে, তাহলেই তা অচিরেই কোটি কোটিতে পরিণত হবে। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র গ্রাস করবে। বিপদের গুরুত্ব বোঝার পর সৈন্যবাহিনী কার্বোলিক এ্যাসিডের স্প্রেয়ার নিয়ে ঐ লক্ষ লক্ষ জেলি ফিসবাহিনীকে আক্রমণ করল। প্রথম প্রথম লাখে লাখে ওরা মারা পড়তে থাকল ঠিকই। কিন্তু তার পরে জেলি ফিসবাহিনীও গেরিলা কায়দায় এগোতে থাকল। ধ্বংস স্তুপ দেখেই তাদের অস্তিত্ব অনুমান করা যেতে লাগল। এখানে-সেখানে একটা-আধটা মানুষ বা পশুর অর্ধগলিতে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল।

একটা গরুর মৃতদেহ দেখে ডঃ চট্টরাজ বিচার করলেন যে, জেলি ফিসবাহিনী যে গতিতে এগোচ্ছে, তাতে সমুদ্রে পৌঁছতে আর মাত্র দুদিন লাগার কথা। তার মানে পৃথিবীর দুটো দিন। ভাবনায় দুঃশ্চিন্তায় তার সব চুল সাদা হয়ে যাবার অবস্থা হল। কে জানে কখন একটা জেলি ফিস লুকিয়ে চুরিয়ে সমুদ্রের জলে নেবে পড়বে।

পিন্টুর মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলল। সে সোজা বেতার যন্ত্রটা নিয়ে পুকুর পাড়ে চলে এল।

পুকুরের জলের সঙ্গে বেতার সংযোগ করতেই ভাইরাসের খুশী খুশী গলা শোনা গেল, সুপ্রভাত আমার ছোট্ট বন্ধু।

পিণ্টু রাগত গলায় বলল, তোমায় বন্ধু বলে স্বীকার করতে আমার লজ্জা হচ্ছে। তুমি অনিল কাকুকে খেয়ে ফেলেছ। পৃথিবী ধ্বংস করার জন্য জেলি ফিস বাহিনী পাঠিয়েছে সমুদ্রের দিকে।

ভাইরাস বলল, রাগ কোর না। ডঃ বসু রায় আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল: আত্মরক্ষার অধিকার আমার নিশ্চয় আছে। আর পৃথিবী ধ্বংসের কথা বলছ? শোন, আমি আমার মত পালটেছি। ভেবে দেখেছি, জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জিনিস। আমি সারা জীবন এই পুকুরে থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করতে চাই। ওই জেলি ফিস বাহিনীকে আমি ধরবার উপায় বলে দিতে পারি। তবে একটা শর্তে।

কি তোমার শর্ত?

আমাকে আজীবন বই পড়ে শোনাতে হবে। রাজী?

রাজী। পিণ্টু বলল।

বেশ। তবে তুমি ওদের চলার পথে নুন দিয়ে একটা মোটা দাগ টেনে দাও। ওদের পথের দুপাশে নদী আছে। কিন্তু ওরা মিষ্টি জলের নদী পেরোবার চেষ্টা করবে না মারা পড়ার ভয়ে। নুনের সংস্পর্শে এলে ওরা নুন খেয়ে মাতাল হয়ে যাবে। তখন তাদের কাচের পাত্রে ধরে এই পুকুরে মিশিয়ে দিতে হবে। পারবে?

পারতেই হবে। বলে পিণ্টু সোজা কাকুর কাছে ছুটল।

নুনের স্পর্শে প্রথমে হাজারে হাজারে,—তারপর লাখে লাখে জেলি ফিস ধরা পড়তে থাকল। শেষে কতকদিন আর একটাও ধরা পড়ল না। নতুন কোন ধ্বংসলীলার কথাও শোনা গেল না বেশ কিছুদিন। সবাই এবার নিশ্চিন্ত হ'ল।

পিণ্টু কিন্তু তার ভাইরাসকে দেওয়া কথা ভোলে নি। সে কাকাকে সঙ্গে করে বেতার যন্ত্রটা নিয়ে পুকুর পাড়ে এসে হাজির হল। বেতার সংযোগ করতেই ভাইরাস বলল, কেমন আছ আমার ছোট্ট বন্ধু? আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। আমরা ভাইরাসের প্রকৃতির নিয়মে জন্মগ্রহণ করি। সংখ্যায় বাড়ি। মহামারীর সৃষ্টি করি। আবার প্রকৃতির নিয়মেই মারা যাই। আমিও সেই নিয়মের বাইরে নই। আমার সময় হয়ে এসেছে।

ভাইরাসের গলা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল, আমার চোখে অন্ধকার রাত্রি নেমে আসছে। ওই দেখ, একটা পোকা আবার আমার জলে নামবার চেষ্টা করছে। বিদায় প্রিয় বন্ধু। বিদায়……।

আর শোনা গেল না ভাইরাসের কণ্ঠস্বর। পিণ্টুর চোখে জল। বেতার সংযোগ ছিন্ন করে উঠে দাঁড়িয়ে সে অবাক হয়ে দেখল মাছের আশায় একটা মাছরাঙা পুকুরের জলে ছোঁ মারল। তার কিছুই হল না। প্রকৃতির নিয়মে ভাইরাস মারা গেছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

সুতপন চট্টোপাধ্যায়

বিল্টু পিঙ্কি ও বরফ

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল বিল্টুর। মোটা কম্বলের নীচে বেশ গরমে শুয়েছিল, হঠাৎ পিঙ্কি ঘুমের ঘোরে কম্বলটা নিজের দিকে টেনে নিতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা ছুচ তার মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিল্টু তড়াক করে উঠে দেখল পিঙ্কি জড়োসড়ো হয়ে বিছানার কোনের দিকে ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছে। কাল রাতে বেট করেছিল পিঙ্কি দেখিস আমি আগে উঠবো।' বিল্টু বলেছিল 'আমি আগে।'

'যদি আমি আগে উঠি কি দিবি?'

'সাউণ্ড অফ্ মিউজিক দেখাব।' উত্তর দিয়েছিল বিল্টু।

শুনেই লাফিয়ে উঠেছিল পিঙ্কি 'দেখাবি?' ঠিক—তো?

বিটু খানিকটা তাচ্ছিল্য করে বলেছিল বেশী লাফাস না। সে চান্স তোকে দিচ্ছি না।'

'দেখাতেই হবে বলে দিলাম। দে—খিস।' বলে নীচে ঢুকে পড়েছিল পিঙ্কি। কিন্তু সে-ই চালে ভুল করে ফেলল ঘুমের ঘোরে। হঠাৎ টান না দিলে তো আর বিল্টুর ঘুম ভেঙে যেতোনা! পিঙ্কির ঘুম, গভীর। সে টেরই পেল না ভোর বেলা তার 'সাউণ্ড-অফ্-মিউজিক' নিজের দোষে হাত ছাড়া হয়ে গেল। বিল্টু কোট টা তাড়াতাড়ি গায়ে চড়িয়ে বেশ জোরে নাড়াল কম্বল ঢাকা পিঙ্কিকে বলল, 'এই দিদি, ওঠ—সকাল হয়ে গেছে—মা চা করছে।'

কোলকাতায় ঘুম থেকে ওঠা নিয়ে কোনদিন প্রতিযোগিতা হয়নি। বিল্টু বিল্টুর মতো, পিঙ্কি পিঙ্কির মতো। কিন্তু এখানে সকালে ওঠার মধ্যে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়েছে ওরা। বেড়াতে এসে এমন পাহাড়ী জায়গায় ভোর না দেখলে, ঠাণ্ডার মধ্যে দৌড়েতে না পারলে দিনটাকে কেমন মুণ্ডু কাটা কনিষ্ক মনে হয়। ঘরের মধ্যে হিটার জ্বলছে, তবু ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে হাতের আঙুল।

দাঁতে দাঁত ঠক্ ঠক্ শব্দ ঠাণ্ডাকে বস মানাতে হচ্ছে মাঝে মাঝে। বিটু জানালা ফাঁক করল একটু। সেই ফাঁকে চোখ রেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল সে। "দিদি, এই দিদি, স্নো-ফল"।

বিল্টুর ডাকের শব্দে পিঙ্কির ঘুম গেল ছিঁড়ে। জড়িয়ে বিছানায় বসেই দেখল বিল্টু জানালায় হু হু করে উঠল বুকের ভিতর। এবারেও সাউণ্ড-অফ্-মিউজিক' হাতছাড়া হয়ে গেল? গভীর দুঃখে আবার সে বিছানায় গোত্তা খেতে যাবে এমন সময় বিল্টু তার হাত ধরে এক টান দিল। 'তুই একটা গাধা' তাড়াতাড়ি ওঠ, কি দারুন স্নো-এল। বরফ ঝরে পড়ছে পাহাড়ে।'

স্নো-ফল? এতোক্ষনে শব্দটা পিঙ্কির মাথায় জোরে ধাক্কা মারে। একলাফে সে বিল্টুর পিটের উপর উঠে এল। তারপর জানালার ফাঁক দিয়ে দেখল চরাচর জুড়ে বরফ বৃষ্টি। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে সাঁ সাঁ। এমন দৃশ্য বই পড়ে কল্পনা করা যায়? নিজের চোখে দেখার আনন্দে বিল্টু ভুলে গেছে গত রাতের বেট। পিঙ্কির বুকে হেরে যাওয়া দুঃখ জমে ছিল, স্নো-ফল দেখতে দেখতে সব দুঃখ গলতে শুরু করল। সত্যি তো! বিল্টু না উঠলে ঘুমের মধ্যে হয়ে যেতো স্নো-ফল। বিল্টু সবাইকে বুক ফুলিয়ে বলতো নিজের দেখা বর্ণনা। আর সে ভ্যাবলা বনে যেতো। এটা সাউণ্ড-অফ্-মিউজিক না দেখার চেয়ে অনেক দুঃখজনক ঘটনা। পিঙ্কি মনে

মনে লাভ ক্ষতির হিসেব করে দেখল ছবিটা হয়তো আবার আসবে কোলকাতায়, কিন্তু শোনমার্গের স্নো-ফল? সে-ই আসলে জিতে গেছে কিন্তু বিল্টুকে সে কথা বুঝতে দিল না। পাহাড়ের গায়ে প্রায় ঝুলন্ত এই বাঙলোর নীচে গভীর খাদ। চারপাশ ঘেরা মাথা উঁচু পাহাড়। একটু আগে গাছগুলো দেখা যাচ্ছিল। দেখতে দেখতে বরফ ঝড়ে ঢাকা পড়ে গেল। মুহু মুহু এই প্রকৃতি বদল দু চোখ ভরে দেখছিল বিল্টু আর পিঙ্কি। হঠাৎ মায়ের ডাক। দু কাপ চা চটপট শেষ করে আবার জানলায় ফিরে এল ওরা। এতক্ষনে চারপাশ ফর্সা। যেন চা খাওয়ার ফাঁকে বালতি বালতি রূপো ঢেলে দিয়েছে কেউ। বিল্টু আর পিঙ্কি ঠিক করল দুজনে বেরোবো।

রোজ রোজ বাবা মার সঙ্গে বেরোনোটা ভাল দেখায় না। ওরা কি এখনো 'ল্যাবেনচুস, ল্যাবেনচুস' বায়না করে?

ক্যালেণ্ডারে পাহাড়ে ওঠার একটা ছবি দেখেছিল বিল্টু। দু'টো লোক পিঠে সিলিণ্ডার

বেঁধে, মুখে মুখোস এঁটে, একটা লাঠি হাতে পা ফেলে ফেলে উপরে উঠছে। পা ডুবে গেছে সাদা বরফে। সামনের লোকটির বেল্টের সঙ্গে পিছনের লোকটির বেল্ট টানা দড়ি দিয়ে বাঁধা। কিন্তু এতো বড় দড়ি তো নেই? মুহূর্তে মাথায় খেলে গেল সুটকেসে মা'র জামা-কাপড় টাঙানোর জন্য কেনা তারের বোলটার কথা।

বেরোনোর সময় কোটের পকেটে লুকিয়ে পুড়ে নিল বিলটু। পাহাড়ের মাথা থেকে বরফের ঢল গড়িয়ে নেমে এসেছে নীচে। ডানদিকের রাস্তা ধরে কিছুটা এগোতেই পাহাড়ে ওঠার রাস্তা। বিলটু কোটের বেল্টের সঙ্গে তার বেঁধে অন্য প্রান্ত পিঙ্কির কোমরে কষে বাঁধল। তারপর ক্যালেণ্ডারের ভঙ্গিতে উঠতে লাগল উপরে। কিছুটা উঠেই বিলটু পিছন ফিরে বলল, 'দিদি, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, একটু একটু হচ্ছে।'

'তাহলে আমরা অনেকটাই উপরে উঠে এসেছি। কত হাজার ফুট হবে বলতো?'

হাজার ফুট? কুড়ি ফুটই হয়নি এখনো।

তুই কিছু জানিস না। পাহাড়ের উচ্চতা কি পাহাড়ের নীচ থেকে মাপে? সমুদ্রতল থেকে মাপতে হয়।

তুই জানিস তাহলে। তবে চল পাহাড়ের উচ্চতা মাপতে আগে সমুদ্রতলের দিকে যাই।

তর্ক করিসনাতো। আস্তে আস্তে উঠে আয়।

পাহাড়ের উপরে উঠলে পাহাড়কে আর গভীর দেখায় না। উপর থেকে নীচে তাকাতে ভয় করে না। কেবলি মনে হয় গড়িয়ে যাই। তখনি মনটা বিদ্রোহ করে ওঠে। গড়িয়েই যদি নামি তবে আরো উপর থেকে গড়াবো। এমনি করে পাহাড়ের চূড়ো টানে। টানটা বুকের মধ্যে স্পষ্ট টের পায় বিলটু। পিঙ্কি কিছুটা উঠে হাঁপিয়ে গেছে। দু মিনিট হল্ট, তারপর আবার ক্যালেণ্ডারের ভঙ্গি।

বেশ কিছুটা রাস্তা পেরিয়ে ওরা এসে পৌছল পাহাড়ের দক্ষিন কোনে। গোড়ালী ডোবা বরফে দাঁড়িয়ে বিলটু জিজ্ঞেস করল পিঙ্কিকে 'বলতো দিদি' কোন দিকটা পশ্চিম?'

চারপাশ ধপধপে সাদা কম্বল মোড়া পাহাড়, ওখানে দাঁড়িয়ে কোন দিকই ঠিক করা যায় না। সবদিকই পূর্ব কিংবা পশ্চিম মনে হয়।

পিঙ্কি উত্তর দেয় না। ভুল বললে যদি বিলটু বেট্ ধরে।

পারলি নাতো? জানিস কাকুকে নিয়ে এলে দারুন হতো। কত কি জানতে পারতাম।

কাকুর নাম শুনেই রেগে গেল পিঙ্কি।

চুপ কর। সব সময় বীজগণিতের ফরমুলা জিজ্ঞেস করে। অঙ্ক ছাড়া যেন বিজ্ঞানের জানার কিছু নেই এমন একটা ভাব।

নারে দিদি, কাকু আগে পাহাড় বিশেষজ্ঞ ছিল, এখন সমুদ্র নিয়ে পড়াশুনা করে।

তাহলে বিলটুর ভালো পাগল না। কাকুকে একদম পছন্দ করেনা পিঙ্কি। দেখলেই দশহাত দূর দিয়ে পালায়। সেটা কাকুর ভয়ে না বীজগণিতের ভয়ে বুঝতে পারে না যে। কথা বলতে বলতে ঢালু জায়গায় চলে এসেছে ওরা। হঠাৎ কড়ড়-কড়ড় শব্দ। বিলটুর চোখ তো ছানাবড়া। ধ্বস নামবে নাতো? সে ভয়ে পিঙ্কির হাত চেপে ধরল। শব্দটা পিঙ্কির কানে যেতেই সে এদিক-সেদিক দেখছিল। কোথা থেকে আসছে শব্দটা? সামনের পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাওয়া পাইপ থেকে? সন্দেহ হতেই পাইপের কাছে ছুটে গেল পিঙ্কি। খানিকটা জায়গা বরফ সরিয়ে দেখল পাইপটা চিরে গেছে এক পাশে। বিলটুর দিকে তাকিয়ে বলল কি হয়েছে বলতো?

বিটু তো অবাক। সত্যি তো পাইপটা ফাটল কি করে?

পিঙ্কি বলল নিশ্চয় গরম জল যাচ্ছিল পাইপে। যেতে যেতে হঠাৎ ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে গেছে। ব্যাস চড় চড় করে ফেটে গেছে পাইপ।

বরফ হলে পাইপ ফাটবে কেন? গোল গোল চোখে প্রশ্ন করে বিলটু।

ফাটবে। গরম জলে তো জলীয় বাষ্পকনা কম থাকে। গরম জল জমে বরফ হয়ে তাই আয়তনে বেড়ে যায়। তাতেই পাইপের গায়ে চাপ পড়ে। পাইপ চাপ সহ্য না করতে পারলে তো ফাটবেই। কিন্তু ঠাণ্ডা জল আয়তনে ততোটা বাড়ে না।

তুই বুঝি ফিজিক্যাল স্যায়েন্স বই এ পড়েছিস?

বলতো কেন? বলে বরফের উপর কিছুটা ছুটে যায় পিঙ্কি।

ঠিক তখনি বিলটু চিৎকার করে 'দেখ দিদি, ওখানে একটা পুকুর। পাহাড়ী পুকুর। চল যাবি?'

বলার সঙ্গে সঙ্গে সামনের পা এগোতেই নরম বরফে পা হড়কে গেল বিলটুর। বিদ্যুৎ গতিতে নীচের দিকে গড়াতে লাগল। তারের টানে পিঙ্কি পড়ে গিয়েছিল বরফে। দুজনে প্রানপনে তার ধরে সমান্তরাল গড়াতে লাগল। বিলটু একবার মাত্র চিৎকার করে বলল 'তার ছাড়িস না দিদি।' পিঙ্কির মুখে চোখে তখন বরফ, কিছুই শুনতে পেল না সে।

গড়াতে গড়াতে সামনে পড়ল একটা বিশাল ঢিবি কয়েক মুহূর্তের জন্য পিঙ্কিকে দেখতে পেল না বিলটু। পিঙ্কি বরফ খণ্ডের আড়ালে গড়িয়ে গেছে। তারটা বরফের গায়ে ঢুকে যেতেই বিলটু ভাবল এবার আটকে যাবে তারা। কিন্তু গড়ালে টানে তারাটা সোঁ সোঁ গতিতে বরফ কেটে নেমে আসতে লাগল। ঢিবির ভিতর দিয়ে তারাটা বাইরে বেরিয়ে এলে বুকটা ধপাস করে উঠল বিলটুর। এতো বড় কাটা বরফ খণ্ড এবার তারও দিদির ঘাড়ে ভেঙ্গে পড়লে খুঁজে পাওয়া যাবে না এই বরফের দেশে। নির্ঘাত মৃত্যু। অথচ আশ্চর্য্য ঢিবিটা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল। একটা টুকরোও তা ওদের গায়ে ভেঙ্গে পড়ল না। ওরা আবার গড়াতে লাগল। সারা শরীরে বরফ লেগে পিঙ্কিকে মনে হচ্ছে একটা সাদা খরগোশ? যত নীচে নামছে, গতি বেড়ে দ্রুত। কিছুদুর নেমে আবার সামনে পড়ল আবার একটা বড় বরফ চূড়ো। এখানেও আটকাল না বিলটু আর পিঙ্কি। বরফ কেটে কেটে গড়িয়ে গেল নীচে হুড়মুড় করে ভেঙ্গেও গেল না চূড়োটা।

যে জায়গাটা বিলটু দেখেছিল পুকুর, সেখানে জলের চিহ্ন মাত্র নেই। পাহাড়ের গায়ে রোদ পড়ে চিক্‌চিক্ করছে। মেঘের ছায়া পড়লে উপর থেকে পুকুর পুকুর মনে হয়। গড়াতে গড়াতে এখানে আছড়ে পড়ল বিলটু। সঙ্গে সঙ্গে টের পেল তারের অন্য দিকে পিঙ্কি নেই। তার খুলে বেড়িয়ে এসেছে কোমর থেকে। ভয়ে দিশেহারা বিলটু চোখের উপর থেকে বরফ কুচি সরিয়ে চারদিক দেখল। কোথা-ও পিঙ্কিকে দেখা যাচ্ছে না। সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল 'দি—দি,—দি,—দি।'

একটু পরেই সামনের পাহাড় থেকে ভেসে এল বিলটুর ডাক। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বিলটু আবার ডাকল 'পিঙ্কি—ই—ই।'

স্তম্ভিত হয়ে গেল বিলটু। আবার তার গলা পাহাড়ের চারদিকে থেকে ভেসে আসতে লাগল। তবে কি পাহাড় গুলো তার ভয় বুঝতে পেরে ডেকে দিচ্ছে পিঙ্কিকে? পরক্ষনেই দিদির গলা ভেসে এল পাহাড়ের চারদিক থেকে। কোন দিক থেকে শব্দটা প্রথম এল দেখতে গিয়ে বিলটুর চোখে পড়ল পাশের বরফের ঢিবির আড়াল থেকে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে পিঙ্কি। কাছাকাছি এসে বলল, কি সুন্দর প্রতিধ্বনি হল দেখলি?'

প্রতিধ্বনী? শব্দটা চেনা চেনা লাগল বিটুর। তারপরই হঠাৎ মনে পড়ল আরে এবারের পবীক্ষায় এসেছিল না? ভয়ে কেমন হারিয়ে গিয়েছিল মাথার মধ্যে।

কিন্তু কি করে বাড়ি ফিরবি?

বাড়ি ফেরার কথাটা মনে হতেই পিঙ্কির দুচোখ ভরে ঝাপসা হয়ে এলো। তুষার ঢাকা বিস্তৃত পাহাড়ের গায়ে কোথায় রাস্তা? কোনদিক দিয়ে নেমে গেলে বাঙলোর পথ? এদিকের রাস্তা নিরাপদ কিনা কিছুই জানে না পিঙ্কি। বরফ ঢাকা

যদি কোন খাদ থাকে? এসব ভাবতে ভাবতে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল আমরা কোনদিনই আর বাড়ি ফিরতে পারব না বিলটু। কিছু মাথায় আসছে না যে?

ঠিক সেই সময় বিলটুর কানে এল লরীর গোঁ গোঁ শব্দ। কাছাকাছি পাকা রাস্তা আছে নাকি? সামনের দিকে ঝুঁকে সে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। 'ওই দেখ দিদি' শোনমার্গের রাস্তাটা না? দেখেই পিঙ্কি চিনতে পারল। রাস্তার মাঝামাঝি বিরাট বরফের পাঁচিল। রাস্তাটাকে দুভাগ করে ওয়ান ওয়ে করে দিয়েছে। একটা পেট্রোল বোঝাই লরী এগিয়ে আসছে। রাস্তাটা ঢুকে গেছে তাদের পায়ের নীচের পাহাড়ের ভিতর।

বিটু বলল 'ভয় কি? তুই আবার তারটা ভালো করে বাঁধ।'

তারপর?

'তুই ওদিকে গিয়ে তার ধরে ঝুলে পড়বি। আমি এদিকে। সোঁ সোঁ করে বরফ কেটে নেমে যাবো নীচে।

'পাঁচিল ভেঙে পড়বে না আমাদের ঘাড়ে?'

'দূর—কত বরফ কেটে এলাম। তুই কি কিছুই দেখিস নি?'

'না, ভয়ে চোখ বুঝে ছিলাম।' উত্তর দেয় পিঙ্কি।

বিলটু তার এগিয়ে দিয়ে নিজেরটা ভালো করে টাইট করল। তারপর পাঁচিলের দুদিকে দুজনে ঝুলে পড়ল। মাটিতে নেমে বিলটু পিঙ্কিকে জিজ্ঞাসা করল 'বলতে পারবি? কেন বরফের ভিতর দিয়ে তার এমন কাটতে কাটতে নেমে এল অথচ বরফের কিছু হল না? দেখ কেমন জোড়া লেগে গেছে?'

পিঙ্কি অবাক হয়ে দেখল বরফের মধ্যে কোন কিছু নেই। কে বিশ্বাস করবে এইমাত্র তারা এই বরফ কেটে নীচে নেমেছে। কোন উত্তরই পিঙ্কির মাথায় এল না। বিলটু বলল 'পারলি না তো। এখানে কাকু থাকলে···পিঙ্কি ঠোঁট বেঁকিয়ে উত্তর দিল 'এটা আমার আবিস্কার। কোলকাতায় কাকুকে বলতেই হবে।'

বিকেলে বারান্দায় বসে সিগারেট খাচ্ছিল কাকু। বাড়ি ঢোকার রাস্তায় কাকুর বাড়ি। আগে ঢুকে পড়ল বিটু। পিঙ্কি যাবে না। বিলটু টানতে টানতে পিঙ্কিকে নিয়ে এল কাকুর সামনে ওদের দেখেই কাকু বলল 'কিরে কবে ফিরলি?'

প্রবল উত্তেজনা বুকে বিলটু বলল 'এখনো বাড়ি ঢুকিনি। তোমাকে একটা খবর দিতে এলাম। আমি একটা দারুণ ব্যাপার আবিস্কার করেছি। তোমায় বলতে এলাম।'

আবিস্কার? কি আবিস্কার? কাকুর চোখ সরু হয়ে এলো।

একটা তারের সাহায্যে দুজন পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে নীচে নেমে আসতে পারে।

মানে? বিস্ময়ে বড় বড় চোখে কাকু তাকাল।

একটা তারের দুটো দিক ধরে যদি দুজন বরফের মাথা থেকে ঝুলে পরে, তবে বরফ কাটতে কাটতে তারা নেমে আসবে মাটিতে অথচ বরফের কিছু হবে না। কাটার দাগও থাকবে না।

শুনে হো হো করে হেসে উঠল কাকু। বলল তাতো হবেই। এতে আর আশ্চর্য কি? তার যখন বরফের উপর দু দিকের ভারের জন্য চেপে বসে যায় তখন তারের ঠিক নীচে বরফের উপর চাপ পড়ে। এই চাপে ওই অংশের বরফের গলনাঙ্ক নেমে যায় ফলে বরফ হয়ে যায় জল। যেই জল হয়ে যায় তখনি সে তার ছাপিয়ে তারের উপরে উঠে আসে। কিন্তু সেখানেতো কোন চাপ নেই। ফলে গলানঙ্ক আর শূন্য ডিগ্রিতে পৌছে যায়। তার মানে জল হয়ে যায় বরফ। এমনি করে তার বরফ কাটতে কাটতে নীচে নামে, আর জল উপরে উঠতে উঠতে বরফ হয়। জোড়া লেগে যায় কাটা জায়গা। বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

বিলটু অবাক হয়ে শুনছিল। পিঙ্কিও।

কাকুর কথা শেষ হলে মনটা খারাপ হয়ে গেল বিলটুর। এতো বড় আবিস্কারটা হাতছাড়া হয়ে গেল?

বিলটুর মনের অবস্থা বুছতে পেরে পিঙ্কি পিঠে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে বলল 'ওই জন্যই কাকুর কাছে যেতে চাইনি। না গেলে এখুনি তো মনটা খারাপ হতো না।'

কিন্তু মনে মনে বলল, 'কাকু শুধু অঙ্কই জানে না, ফিজিক্যাল সাইন্সও কিছু কিছু জানে।'

অজয় ঘোষ

ধাঁধা

পূজা সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। বঙ্গের তাস্‌ড়ে

দিন		প্রথম টেবিল	দ্বিতীয় টেবিল	তৃতীয় টেবিল
১ম	—	অ আ — এ ঔ	উ ঐ — ঋ ও	উ ঌ — ইঈ
২য়	—	অ ই — ঐ আ	ঊ ও — ঌ ঐ	ঋ এ — ঈ উ
৩য়	—	অ ঈ — ও ই	ঋ ঔ — এ আ	ঌ ঐ — উ ঊ
৪র্থ	—	অ উ — ঔ ঈ	ঌ আ — ঐ ই	এ ও — উ ঋ
৫ম	—	অ ঊ — আ উ	এ ই — ও ঈ	ঐ ঔ — ঋ ঌ
৬ষ্ঠ	—	অ ঋ — ই উ	এ ঈ — ঔ উ	ও আ — ঌ এ
৭ম	—	অ ঌ — ঈ ঋ	ও উ — আ ঊ	ঔ ই — এ ঐ
৮ম	—	অ এ — উ ঌ	ঔ ঊ — ই ঋ	আ ঈ — ঐ ও
৯ম	—	অ ঐ — ঊ এ	আ ঋ — ঈ ঌ	ই উ — ও ঔ
১০ম	—	অ ও — ঋ ঐ	ই ঌ — উ এ	ঈ ঊ — ঔ আ
১১শ	—	অ ঔ — ঌ ঔ	ঈ এ — ঊ ঐ	উ ঋ — আ ই

প্রতি টেবিলে প্রথম দুটি অক্ষর এক পক্ষ। অন্য দুটি অক্ষর বিরোধী পক্ষ।

২। বেগতিক গতিবেগ

প্রথম ট্রেনের গতিবেগ দ্বিতীয় ট্রেনের ডবল।

৩। দানবীর

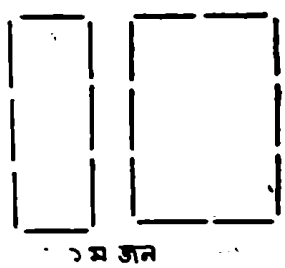

১ম জন

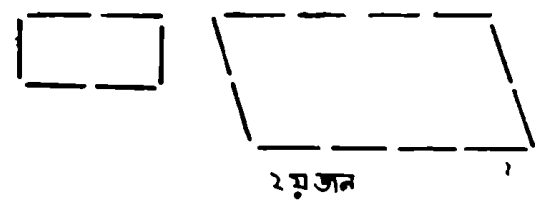

২য় জন

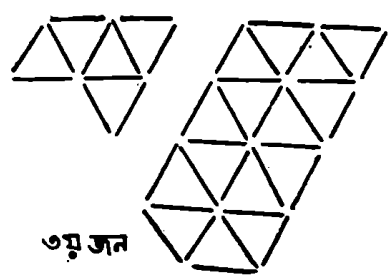

৩য় জন

৪।

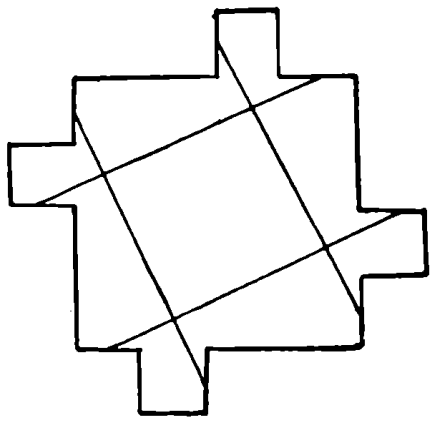

৫।

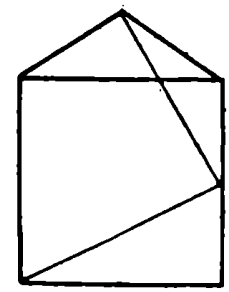

রইল বাকী এক : উত্তর

৪৪-এর ঘরে খালি রাখলে আঠারো দৌড়ে বোর্ড খালি করা যায়।

৪৬-৪৪, ৬৫-৪৫, ৫৭-৫৫, ৫৯-৫৬, ৫২-৫৪, ৭৩-৫৩, ৪৩-৬৩, ৭৫-৭৩-৫৩, ৩৫-৫৫, ১৫-৩৫, ২৩-৪৩-৬৩-৬৫-৪৫-২৫, ৩৭-৫৭-৫৫-৫৩, ৩১-৩৩, ৩৪-৩২, ৫১-৩১-৩৩, ১৩-১৫-৩৫, ৩৬-৩৪-৩২-৫২-৫৪-৩৪, ২৪-৪৪।

রেডক্রস :—৫৪-৭৪, ৩৪-৫৪, ৪২-৪৪-৬৪, ৪৬-৪৪, ৭৪-৫৪-৩৪, ২৪-৪৪ সবসুদ্ধ ৬ দৌড়।

পর্বত :—৫৪-৭৪, ৪৫-৬৫, ৪৪-৪২, ৩৪-৩২-৫২-৫৪, ১৩-৩৩, ৭৩-৭৫-৫৫-৫৩, ৬৩-৪৩-২৩-২৫-৪৫, ৪৬-৪৪—সবসুদ্ধ ৮ দৌড়।

এক পেয়ে বর্গ :—৫৫-৭৫, ৩৫-৫৫, ৪২-৪৪, ৬৩-৪৩-৪৫-৬৫, ৩৩-৩৫-৩৭-৫৭, ৫৫-৫৩-৫১-৩১-৩৩-১৩-১৫-৩৫, ৭৫-৫৫, ৭৪-৫৪-৫৬-৩৬-৩৪, ২৪-৪৪—সবসুদ্ধ ৮ দৌড়।

তীর :—৩৬-৩৪, ৫৬-৫৪, ৫১-৫৩-৩৩-৩৫-৫৫, ৬৫-৪৫, ৪১-৪৩, ৩১-৩৩-৫৩-৫৫-৩৫, ৪৭-৪৫, ৪৪-৪৬, ১৫-৪৫, ৪৬-৪৪ সবসুদ্ধ ১০ দৌড়।

হাওয়া কলের পাখা :—৪২-৪৪, ২৩-৪৩, ৪৪-৪২, ২৪-৪৭ ৩৬-৩৪, ৪৪-২৪, ৪৬-৪৪, ৬৫-৪৫, ৪৪-৪৬, ৬৪-৭৪, ৫১-৫৪ ৪৪-৪৬, ৩১-৩৩, ৫১-৩১, ১৫-৩৫, ১৩-১৫, ৫৭-৫৫, ৩৭-৫৭, ৭৩-৫৩ ৭৫-৭৩, মোট ২০ চাল।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর :—

চায়ের টেবিলটা বাগানের চারকোণ থেকে সমান দূরে আছে। সুতরাং বাগানটি একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ। এর ক্ষেত্রফল বার করতে গেলে প্রথমেই দরকার এর পরিসীমা। অর্থাৎ ৮০ + ৪৫ + ১০০ + ৬৩ = ২৮৮ সুতরাং অর্ধ পরিসীমা = ১৪৪।

বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল হবে।

(১৪৪—৮০) × (১৪৪—৪৫) × (১৪৪ – ১০০) × ১৪৪—৬৩) = ৬৪ × ৯৯ × ৪৪ × ৮১ = ৪৭৫২ বর্গ মিটার।

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

প্ল্যাস্টিক আবিষ্কারের কাহিনী

'প্ল্যাস্টিক' কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ 'প্ল্যাস্টিকোস্' থেকে। প্ল্যাস্টিকোস্ কথাটার মানে হলো, 'যা ছাঁচে ঢালাই করা যায়।' তোমরা হয়তো ভাববে, প্ল্যাস্টিক জিনিষটা তো শক্ত। জিনিষ আবার ছাঁচে ঢালাই হবে কেমন করে? ঠিক কথা, আমরা যে সব প্ল্যাস্টিকের জিনিষ ব্যবহার করি সে-গুলো মোটামুটি বেশ শক্ত। কিন্তু তৈরী করার প্ল্যাস্টিকের চেহারাটা থাকে নরম কাদার মতো।

আমাদের দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে প্ল্যাস্টিক জিনিষটার আমদানী হলে কবে থেকে বলতো? খুব বেশী দিনের কথা নয়, অনেকটা হাল আমলে বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরেই প্ল্যাস্টিক বিশেষ ভাবে আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে পাশ্চাত্য দেশে অর্থাৎ বিশেষ করে য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্ল্যাস্টিকের নানারকম আবিষ্কার হতে আরম্ভ হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। তবে প্রথম প্ল্যাস্টিক আবিষ্কার হয়েছে আরও একশো বছর আগে।

কে সর্বপ্রথম প্ল্যাস্টিক আবিষ্কার করেছিল বলো তো? হ্যাঁ, ঠিক তোমাদের মতোই একটি অল্পবয়সী ছোট্ট ছেলে। নাম জন। জন হায়াট। জনের বাড়ি ছিল আমেরিকার ওয়াশিংটন রাজ্যে। জনের প্ল্যাস্টিক আবিষ্কারের গল্পটা কিন্তু ভারি মজার। জন কাজ করতো একটা ছাপাখানায়। পড়াশোনায় মোটেই ঝোঁক ছিল না তার। তাই জনের মা-বাবা অনেকটা বিরক্ত হয়েই তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ছাপা-খানার কাজে। কিন্তু পড়াশোনায় মন না থাকলে কি হবে, বিজ্ঞানের দিকে জনের ছিল বরাবরই দারুণ ঝোঁক। আর এই ঝোঁকই তাকে নিয়ে গেছলো আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান প্ল্যাস্টিক আবিষ্কারের পথে। এই কাহিনীই বলছি।

আগে এক সময় আফ্রিকার হাতির দাঁত আমেরিকায় আমদানী হতো প্রচুর। তখনও প্ল্যাস্টিক চালু হয়নি। কাজেই এই হাতির দাঁত দিয়ে তৈরী হতো নানান সৌখিন জিনিষ—চিরুনী, ছুরির বাট, মেয়েদের নানারকম অলংকার আরও কতো কি। আর তৈরি হতো বিলিয়ার্ড খেলার বল। এই সব হাতির দাঁত মাথায় করে বয়ে আনতো সাধারণত নিগ্রো ক্রীতদাসরা। কিন্তু আমেরিকা থেকে দাসপ্রথা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতির দাঁতের আমদানীও গেল কমে। ফলে যেটুকু আসতে লাগলো তার দাম হয়ে উঠলো আকাশ ছোঁয়া। যারা বিলিয়ার্ড বলের ব্যবসা করতো হাতির দাঁতের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা পড়লো

খুব মুশকিলে। তারা ঘোষণা করলো, কেউ যদি হাতির দাঁতের অনুরূপ বিকল্প কোন রাসায়নিক পদার্থ বের করতে পারে, যা দেখতে এবং গুণমানে অবিকল হাতির দাঁতের মতো হবে, তাহলে বিলিয়ার্ড কোম্পানী সেই আবিষ্কারককে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে। এ ব্যাপারে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দিলো তারা।

ছাপাখানায় বসে বিলিয়ার্ড কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের কথাটা জন শুনলো এক বুড়ো কম্পোজিটারের মুখে। দশ হাজার টাকা। জন মনে মনে ভাবলো, হাতির দাঁতের মতো কোন জিনিষের আবিষ্কার করতে পারলে ওই টাকা সে-ও পেতে পারে। টাকাটা পেলে মা-বাবার দুঃখ ঘোচাতে পারবে সে!

তারপর?

তারপর থেকে জনের চোখে আর ঘুম নেই। ভাবনা আর ভাবনা। ছাপাখানার কাজ সেরে বাড়ি ফিরে জন ভাবতে বসে, কেমন করে হাতির দাঁতের মতো কৃত্রিম একটা জিনিষ তৈরি করা যায়।

গভীর রাত নামে।

দূরে গীর্জা থেকে ভেসে আসে ঘণ্টাধ্বনি—ঢং—ঢং—ঢং—ঢং—

রাত বারোটা।

হঠাৎ জানলার সামনে ওক গাছ থেকে বিশ্রী শব্দে ডেকে ওঠে একটা প্যাঁচা। ভয় পেয়ে চমকে ওঠে জন। আর ঠিক সময় তার হাত লেগে টেবিলে রাখা লোহার পেপার ওয়েটটা সশব্দে পড়ে যায় তার পায়ে। অনেকটা জায়গা কেটে যায় মুহূর্তে। রক্ত বের হয়। সে সময় শরীরের কোন জায়গা কেটে ছড়ে গেলে কলোডিয়ন জিনিষটা খুব ব্যবহার করা হতো। জন কাটা জায়গাটায় কলোডিয়ন ঢেলে দিতেই একটু পর রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। জন দেখলো কাটা জায়গাটায় কলোডিয়ন ঢালার সঙ্গে সঙ্গে তা জমে গেল, আর জনের মাথায় ঝটপট একটা বুদ্ধি এসে গেল—এই কলোডিয়ন নিয়ে পরীক্ষা করলে হয় না?

কলোডিয়ন তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় নাইট্রোসেলুলোজ। জন নাইট্রোসেলুলোজ নিয়ে পরীক্ষা করতে বসে গেল। ঠিক এই সময় একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী কর্পূর নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি আবিষ্কার সূত্রে বললেন, কর্পূর কোন তরল পদার্থকে জমাট বাঁধিয়ে দিতে সাহায্য করে। এবার জন ভাবলো, নাইট্রোসেলুলোজের সঙ্গে কর্পূর মিশিয়ে পরীক্ষা করলে কেমন হয়? আর কি আশ্চর্য, এই দুটো জিনিষ একত্র হতেই অবিকল হাতির দাঁতের মতো একটা ঝকঝকে সাদা জিনিষ তৈরি হয়ে গেল। বস্তুটা হাতে নিয়ে বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের মতো জন ও আনন্দে চিৎকার করে উঠলো—'ইউরেকা—ইউরেকা।' অর্থাৎ 'পেয়েছি—পেয়েছি।'

এই হলো প্রথম প্ল্যাস্টিক আবিস্কারের কাহিনী। প্ল্যাস্টিকের আসল রঙ কিন্তু হাতির দাঁতের মতো সাদা। এতে রঙ মিশিয়ে নানা রঙের এবং ছাঁচে ফেলে নানান ডিজাইনের জিনিষ তৈরি করা হয়।

জন হায়াট-এর প্ল্যাস্টিক আবিষ্কারের আরও তিরিশ বছর পরে আরও একধাপ উন্নতমানের প্ল্যাস্টিক আবিস্কার করলেন ইংরেজ বিজ্ঞানী বেকল্যান্ড। তিনি ফর্মালডি হাইড আর ফিনোলের (কার্বলিক অ্যাসিড) সঙ্গে কাঠের মিহিগুঁড়ো মিশিয়ে হাতির দাঁতের মতো সাদা ঝকঝকে একটা জিনিষ আবিষ্কার করলেন। বস্তুটা হলো যেমন হাল্কা, দেখতেও তেমনি ভারি সুন্দর। আর সব চেয়ে মজার ব্যাপার জন হায়াট আবিস্কৃত প্ল্যাস্টিকের মতো এটা কিন্তু আগুনে পোড়ে না, জলেও নষ্ট হয় না। বিজ্ঞানী বেকল্যান্ডের নামানুসারে এর নামকরণ হলো 'বেকেলাইট'।

এই ভাবে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এ পর্যন্ত নানা জাতের প্ল্যাস্টিক আবিস্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। গুণমানে এক জাতের প্ল্যাস্টিক আরেক জাতের থেকে অনেক প্রভেদ। বর্তমানে কাঠকয়লা, খনিজ তৈল—বিশেষত পেট্রোলিয়াম, চুনোপাথর, উদ্ভিদজাত তেল, সমুদ্রের লবনাক্ত জল, তুলো, চর্বি—নানা জিনিষ দিয়ে বিজ্ঞানীরা প্ল্যাস্টিক তৈরি করছেন। উপাদান ভেদে এদের নামকরণও নানারকম। যেমন, বেকেলাইট-প্ল্যাস্টিক, ইউরেকা-প্ল্যাস্টিক, পলি-ইথার প্ল্যাস্টিক, পলি-প্রপিলিন-প্ল্যাস্টিক, সেলুলোজ-প্ল্যাস্টিক, ভিনাইল প্ল্যাস্টিক, স্টিরিন-প্ল্যাস্টিক পলি-ইথিলিন প্ল্যাস্টিক ইত্যাদি।

এবার বলি কি ভাবে প্ল্যাস্টিকের জিনিষ তৈরি হয়। প্ল্যাস্টিকের চিরুণী, বোতাম, মুখ ধোবার ব্রাশ, ছাইদানী, পাউডার কেস, ফুলদানীতে সাজানোর জন্য প্ল্যাস্টিকের নকল ফুল, বর্ষাকালের রঙবেরঙের জুতো, খোকা-খুকুর নানান খেলনা—কি তৈরি হয় না প্ল্যাস্টিকে। আজকাল তো বাড়ির দেয়ালে প্ল্যাস্টিকের পলেস্তরাও হচ্ছে। আমরা যে রেডিও বাজাই, টি, ভি শুনি ওই রেডিও টিভির কেবিনেট গুলোও প্ল্যাস্টিকের তৈরি। বলতে গেলে এখনকার যুগটাই হলো প্ল্যাস্টিকের যুগ।

প্ল্যাস্টিকের খেলনা, আসবাবপত্র—এক কথায় প্ল্যাস্টিকের

তৈরি সমস্ত জিনিষই শাধারণত তৈরি হয়ে থাকে ছাঁচ বা ডাইসের মাধ্যমে। নরম প্ল্যাস্টিক ছাঁচের মধ্যে ফেলে বিভিন্ন জিনিষ তৈরি হয়। এই ছাঁচে ঢালাইয়ের মধ্যেও আবার নানা পদ্ধতি আছে। যেমন 'কমপ্রেশন মোল্ডিং' পদ্ধতি। কমপ্রেশন মানে চাপ দেওয়া আর মোল্ডিং মানে হলো ছাঁচে ঢালাই।

প্ল্যাস্টিকের গুঁড়ো প্রথমে হিসাব মতো ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর ছাঁচটাকে গরম করে নেওয়া হয় বৈদ্যুতিক সাহায্যে। ছাঁচ গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাস্টিকের গুঁড়ো গুলোও ক্রমশঃ নরম হয়ে তরল আকার নেয়। এরপর ডায়াসের হাতল ঘুরিয়ে প্রবল চাপ দিতেই প্ল্যাস্টিকের মধ্যে কিছুটা রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। যার ফলে নরম প্ল্যাস্টিক ছাঁচের আকার নেবার সময় ছাঁচের গায়ে সেটা সেঁটে যায় না। পরে ছাঁচ কিছুটা ঠাণ্ডা হতে ছাঁচের আকৃতি নিয়ে জমাট প্ল্যাস্টিক আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী হয়ে বেরিয়ে আসে।

প্ল্যাস্টিকের জিনিষ তৈরির আরেকরকম পদ্ধতির নাম, ইনজেকশন মোল্ডিং। গম ভাঙানো কলের চোঙায় যেমন গম ঢেলে দেওয়া হয়, এখানেও প্ল্যাস্টিক তৈরির যন্ত্রের মাথায় অমনি একটা চোঙা আছে। এই চোঙার মধ্যে প্ল্যাস্টিকের গুঁড়ো ঢেলে দেওয়া হয়। যন্ত্রের ভেতরে থাকে গরম করার জন্য খুব উঁচু মানের হিটার। যার ফলে প্ল্যাস্টিকের গুঁড়োগুলো ভেতরে গিয়ে গরমে গলে তরল হয়ে যায়। এইবার একটা সরু নলের ভেতর দিয়ে সেই গলন্ত প্ল্যাস্টিক সোজাসুজি ছাঁচে গিয়ে পড়ে। তারপর ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আসে প্ল্যাস্টিকের জিনিষ হয়ে। যেমন চিরুনীর ছাঁচে চিরুনী, বালতির ছাঁচে বালতি এরকম আর কি।

নানা জাতের প্ল্যাস্টিকের নানা গুন। এক জাতের প্ল্যাস্টিকের সঙ্গে আরেক জাতের প্ল্যাস্টিকের গুনগত পদর্থক্য প্রচুর রয়েছে। যেমন কোন প্ল্যাস্টিক প্রচুর তাপ সহ্য করতে পারে, এমন কি আগুনেও গলে না, যেমন সিলিকোন্স জাতীয় প্ল্যাস্টিক। আবার এক জাতের প্ল্যাস্টিক আছে দারুণ ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে, মহাকাশযানের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণে এই ধরণের প্ল্যাস্টিক খুব কাজে লাগে পলিস্টিরিন হলো এই ধরণের ঠাণ্ডা সহ্যকারী প্ল্যাস্টিক।

তোমরা যে সব নাইলন, টেরিলিনের পোষাক ব্যবহার করো সেগুলো কিন্তু সবই প্ল্যাস্টিকের সুতোয় তৈরি। বর্তমানে রেশম জাতীয় প্ল্যাস্টিকের তৈরি পশমদ্রব্যও প্রচুর তৈরি হচ্ছে। যা গরম জামাকাপড়ের মতোই শীত রোধ করতে সমর্থ। এছাড়া ফোম-প্ল্যাস্টিকের তৈরি স্পঞ্জও বর্তমানে বাজারে বেরিয়েছে, যা দিয়ে তোষক, বালিশ, গদি প্রভৃতি শয্যা সামগ্রী তৈরি হচ্ছে!

এক কথায় প্ল্যাস্টিক আবিষ্কার বিজ্ঞানের এক মহান অবদান। বর্তমান জনজীবনে ভাত-কাপড়ের মতোই প্ল্যাস্টিক আজ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তাই বর্তমান যুগটাকে যদি প্ল্যাস্টিকের যুগ বলা হয় তাহলে খুব বেশী বাড়িয়ে বলা হবে কি?

লেখকদের লেখার গতি

প্রণব ভট্টাচার্য

ইস্কুলে শিক্ষকমশাই যখন কিছু নোট দেন তখন বিভিন্ন ছাত্র বিভিন্ন গতিবেগে লেখে। কারুর লেখা খুব দ্রুত, কারুর বা ধীরস্থির বেগে লেখাই মনঃপূত। ঠিক একই রকম ভাবে, বিভিন্ন লেখক তার গল্প/কবিতা প্রভৃতি লেখার সময় বিভিন্ন বেগে লেখেন। কেউ লেখেন ঝড়ের বেগে কেউ লেখন পিঁপড়ের গতিতে কেউ বা আবার ধীরে লিখেও প্রচুর গল্প লেখেন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে টেবিলে বসে।

বালজ্যাক মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ৯০টি গ্রন্থ ২৭০ খণ্ডে শেষ করেছেন দিনের ১৪ ঘণ্টা করে ঝড়ের গতিতে লিখে। ওয়াল্টার স্কট দৈনিক ২৫০০টি করে শব্দ লিখতেন। মহাকবি গ্যেটে 'ফাউস্ট' কাব্য-গ্রন্থটি লিখেছিলেন সুদীর্ঘ ৫৮ বছর ধরে। শোনা যায় আর এক কবি গ্রাপালভোর কথা, তিনি নাকি দু'হাতে একসাথে দুটো কলম ধরে লিখতেন তাই ধীরে হলেও প্রচুর লেখা তিনি লিখেছিলেন।

তবে, লেখা দ্রুত বা আস্তে হলেই যে লেখকের দোষ বা গুণ তা নয়, একটা ভালো কিছু লিখতে গেলে লেখকদের বহু দিন ধরে পড়াশুনা করতে হয় এবং চিন্তা-ভাবনা করে লিখতে হয় সে কথাটাও আমাদের বিবেচনা করে রাখা উচিত।

অতীন ঘোষ

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক

রোগ নিরাময়ে কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটানো বা সর্বরোগহর কোনো অসাধারণ ওষুধ আবিষ্কার করার জন্য নয়, অথচ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন উইলিয়াম অসলার।

তিনি মারা যাবার ত্রিশ বছর পরে ১৯৪৯ সালে আমেরিকার বিখ্যাত মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশানের পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : 'এই বছর গুলি শুধু তাঁর গৌরবই বাড়িয়ে চলেছে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে আজ পর্যন্ত কেউ কোনো ভাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন নি'।

রোগ নির্ণয়ে ভেল্কি দেখানো, অসাধারণ গবেষণা, গ্রন্থরচনা এবং শিক্ষাদানের ব্যাপারে তিনি চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন চিকিৎসা জগতে। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠির বিচার তিনি কি কি করেছেন তা দিয়ে না করে তিনি কি ছিলেন তাই দিয়ে করাই সঙ্গতঃ। রোগীর দেহের সঙ্গে তার মনের চিকিৎসা করার অভূতপূর্ব পদ্ধতির জন্যই তিনি জগতে বিখ্যাত হয়ে থাকবেন।

১৮৪৯ সালে আমেরিকার ওন্টারিওতে এক যাজক পরিবারের অষ্টম গর্ভের সন্তান ছিলেন এই উইলিয়াম অসলার।

মেঝের সঙ্গে প্যাঁচকষ দিয়ে আটকানো ক্লাসের টেবিল খুলে নিয়ে চিলে কোঠায় রেখে আসার জন্য তাঁকে মাত্র পনের বছর বয়সে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

বেসরকারী স্কুলে পড়বার সময় স্কুলের ওয়ার্ডেন ডবলু, এ, জনসন স্কুলের চিকিৎসক ডাঃ জেমস বোভেলের সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবনের মোড় ফিরে যায়। দ্বিতীয় জনের কাছ থেকে চিকিৎসা বিদ্যা এবং প্রথম জনের কাছ থেকে প্রগাঢ় ধর্মচেতনার শিক্ষালাভ করেন তিনি।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে খুব কম লোকের কাছে অনুবীক্ষণ যন্ত্র থাকতো। ডাঃ বোভেলের ছিল। উইলিয়াম অসলার ঐ যন্ত্র নিয়ে পাগল হয়ে থাকতেন, সব সময়ে।

বাবা চেয়েছিলেন ছেলে ধর্ম যাজক হোক কিন্তু ছেলে শেষ পর্যন্ত জেদ করে মন্ট্রিয়ালের ম্যাক গিল মেডিক্যাল স্কুলে থেকে ডাক্তারি পাশ করলেন। তারপর জার্মানি, অষ্ট্রিয়া এবং ইংল্যাণ্ডে গেলেন উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য।

লণ্ডনের এক গবেষণাগারে তিনিই প্রথম আবিষ্কার করলেন মানুষের দেহ থেকে রক্ত টেনে নেবার পর সেটি বেখাপ্পাভাবে জমাট বেঁধে যায় নানা জায়গায়। এই ঘটনা অন্য ডাক্তাররা আগেও লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু অসলার দেখলেন রক্ত টীকে যদি নিয়মিত ভাবে চলমান রাখা যায় অর্থাৎ নাড়ানো যায় তবে সেখানে বর্ণহীন এক ধরনের গোলাকার জিনিষ দেখা দেবে, যাকে তখনকার ভাষায় বলা হতো "তৃতীয় কনিকা" এই কনিকা গুলোই জমাট বাঁধে খুব সহজে। বর্তমানে এর নামকরণ করা হয়েছে অনুচক্রিকা। এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফলে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন অসলার। ম্যাকগিল মেডিক্যাল স্কুলে তাঁকে ফিরিয়া আনলো স্বদেশে এবং মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তাঁকে অধ্যাপক পদ দিলো।

এই বালক অধ্যাপকে'র প্রথম কাজ হলো টুপি ও কোট রাখার ঘরটাকে ল্যাবরেটারীতে রূপান্তরিত করা। নিজের বাৎসরিক আয়ের অর্ধেক প্রায়

৬০০ ডলার খরচ করে কয়েক ডজন অনুবীক্ষণ যন্ত্র কিনলেন ছাত্রদের জন্য।

সংক্রামিত শূয়োরর মাংস খেলে ট্রিকিনোসিস নামের এক অদ্ভুত রোগ হতো কানাডাতে। আট মাস ধরে শূয়োর কাটার দোকানগুলোতে ঘুরে ঘুরে অটোপ্সি করতে লাগলেন শূয়োরদের। সেই সঙ্গে ওই রোগে মৃত রোগীদের পোষ্টমর্টেমও চললো পুরোদমে। জনস্বাস্থ্যের প্রতি এই দরদের ফলে অচিরেই আরও খ্যাতিলাভ করলেন অসলার।

গবেষক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করায় অসলারকে হাসপাতালে রোগী দেখার ব্যাপারে সেরকম প্রাধান্য বা সুযোগ কোনটাই দেওয়া হতো না।

হাসপাতালের বসন্ত বিভাগে ডাক্তারদের পালা ক্রমে পাঠানো হতো। এই সুযোগটা কাজে লাগালেন অসলার। অল্পদিনের মধ্যে অসংক্রামক বিভাগেও পাঠাবার জন্য অনুরোধ করলেন কর্তৃপক্ষকে।

সে যুগে হাসপাতাল গুলো হতো বিষাদময় এবং অন্ধকার। অসলারই প্রথম হাপাতালের ওয়ার্ড গুলোর দেওয়াল রঙীন করা শুরু করলেন. সেই সঙ্গে এলো ফুল। দেহের চিকিৎসার পরিবেশ পাল্টে রোগীদের মধ্য আশা উৎসাহের সঞ্চারে সক্ষম হয়ে ছিলেন এই ডাক্তার।

নতুন নতুন পদ্ধতির প্রর্বতনের ফলে অসলারের সুখ্যাতি এমন বাড়লো যে পেনসিলভানিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ে তাঁকে আমনত্রণ জানালো।

সাধারণ দর্শন এই নতুন শিক্ষকটি পেনসিল ভানিয়ার ছাত্রদের কাছে প্রথমেই বলে বসলেন, "বই বাদ দিয়ে কোনো রোগের লক্ষন বৈশিষ্ট জান বার চেষ্টা করা অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেবার মতো এবং রোগীকে বাদ দিয়ে শুধু বই পড়ার অর্থ আদৌ সমুদ্রে না যাওয়া"। এই বলে শীর্ণকায় একজনকে ক্লাশে এনে ছাত্রদের হাতে কলমে দেখালেন রক্ত শূন্যতা রোগে ভুগছে এমন রোগীর লক্ষন বৈশিষ্ট্য কি কি।। ছাত্ররা চমকে উঠলো। ১৮৮৪ সালে প্রথম শুরু হলো রোগীর পাশে বসে রোগ সংক্রান্ত জ্ঞানলাভ করার সুযোগ! কেস হিষ্ট্রি নেওয়া, রোগীদের পরীক্ষা করার অবাধ সুযোগ পেতে শুরু করলো ছাত্ররা। এইভাবে স্থাপিত হলো আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রথম ভিত্তি প্রস্তর। এর ফলে রোগীদের প্রতি যত্ন নেওয়া বেড়ে গেলো এবং নানা ছাত্রের দ্বারা বারবার পরিক্ষীত হবার ফলে সঠিক রোগ নির্ণয় সম্ভব হলো।

জনস হপকিন্স নামের এক অসাধারণ ধনী ব্যবসায়ীর উইল অনুসারে ট্রাষ্টিরা বালটিমোরে গড়ে তুললেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ আধুনিকতম হাস-পাতাল। এবং সারা পৃথিবী খুঁজে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসা শিক্ষক হিসেবে বেছে নিলেন উইলিয়াম উইলিয়াম অসলারকে। দেখতে দেখতে সারা আমেরিকায় অসলারের ছাত্রদের চাহিদা বেড়ে গেলো ভীষণ ভাবে।

ডাঃ অসলার ঠিক সকাল ৯টা থেকে হাস-পাতালে 'রাউণ্ডে' বের হতেন। নার্স, ডাক্তারদের এক বড় বাহিনী চলতো তাঁর পেছনে। রোগীরা পর্যন্ত বুঝে যেতো ইনি এক অসাধারণ পুরুষ। সবার সঙ্গে হেসে কথা বলতেন। বিশেষ করে শিশুদের জন্যে তিনি যেন প্রাণ দিতে পারতেন, ওদের সঙ্গে তাঁর এক অলিখিত চুক্তি থাকতো, একটা বিশেষ ধরণের শীস্ বাজানোর সুর শুনলেই শিশু রোগীরা বুঝতে পারতো অসলার আসছেন।

রোগ নির্ণয়ে ওঁর দক্ষতা ছিল যাদুকরের মতো। বুকের মধ্যে কোন এক জায়গায় ধমনীতে রক্ত জমে গেছে এক রোগীর। খুবই বিপজ্জনক অবস্থা। কিছুতেই কেউ জায়গাটা ধরতে পারছেন না। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় রোগীকে ভাল ভাবে দেখে সফল হলেন ডাঃ অসলার।

একবার দলবল নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এক অপরিচিত রোগীর পায়ের আঙ্গুল নেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, এবং সঙ্গী ডাক্তারদের চমকে দিয়ে ঘোষণা করলেন ঐ রোগীটির হৃৎপিণ্ডে রক্ত ঝরছে।

মিনেসোটার বিখ্যাত মেয়ো ক্লিনিকের

প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মেয়ো ছিলেন ডাঃ অসলারের ভক্ত, তাঁরই আদর্শে গড়ে তোলেন নিজেকে। একবার এক কমবয়সী রগচটা তরুণ সার্জেন ঝগড়া করে চাকরী ছাড়বার নোটিশ দিয়ে বসলেন। অসলার তাঁকে বোঝালেন আত্মসংযম কতোটা দরকার, বিশেষ করে ডাক্তারদের ক্ষেত্রে। পদত্যাগ পত্রের উত্তরে ডাঃ অসলার তাকে লিখেছিলেন, ওধরণের কিছু করে বোসো না যেন। এমন কোন মানুষ আছে যার দোষ নেই? এখানে তোমার ভবিষ্যত সম্ভাবনা একেবারে প্রথম শ্রেণীর : তাছাড়া তোমাকে আমার দরকারও আছে।' পরবর্তীকালে হাতে কাসিং ব্রেন সার্জারির ক্ষেত্রে দিকপাল হয়েছিলেন। অসলার তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন।

হপকিন্স হাসপাতালে কাজ করলেও ডাঃ অসলার আরও অনেক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আমেরিকার পেডিয়াট্রীক সমিতির সভাপতি ছিলেন, মস্তিষ্কের নার্ভ সংক্রান্ত গবেষণা গ্রন্থের লেখক সব এবং অ্যাঞ্জিনা পিক টোরিক বা হৃদপিণ্ডের নানা ধরণের অসুখ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন পরম বিশারদ (একটা রোগের নামকরণও করা হয়েছে তাঁর নামে অসলারস ডিজিজ), আমেরিকার জাতীয় ক্ষয়রোগ সমিতির সহযোগী-প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। তাছাড়া ম্যালেরিয়া টাইফয়েড এবং সিফিলিস রোগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন ডাঃ অসলার। প্রায় ১২০০ গ্রন্থও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এই ফাঁকে। যার মধ্যে এখনও কতকগুলি ধ্রুপদী রচনার মর্যাদা পেয়ে আসছে।

১৮৯৭ সালে বিখ্যাত ধনকুবের জন, ডি, রকফেলারের অন্যতম উপদেষ্টা ফ্রেডারিক গেটস অসলারের প্রিন্সপলস অ্যাণ্ড প্রাকটিস অফ মেডিসন গ্রন্থটি পড়ে অতি উৎসাহিত হলেন এবং রকফেলারকে দিয়ে রকফেলার ফাউণ্ডেশন গড়ে তুললেন, কারণ অসলার তাঁর গ্রন্থে বলেছিলেন চিকিৎসা বিদ্যায় অনেক গবেষণার বস্তু।

অসুস্থ রোগীদের অতিরিক্ত দাবী মানতে গিয়ে অসলারের স্বাস্থ্য ভাঙ্গতে শুরু করলো। ১৯০৫ সালে তিনি ঠিক করলেন অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে কাজ করতে হবে। নানা জায়গা থেকে নানারকম লোভনীয় প্রস্তাব আসতে শুরু করলো তাঁর কাছে। শেষ পর্যন্ত তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের আমনত্রণে অক্সফোর্ডে অধ্যাপকের পদ নিয়ে চলে এলেন। কয়েক বছর পর তাঁকে স্যার উপাধি দেওয়া হয়।

লণ্ডনে এসে তাঁর প্রথম কাজ হয়েছিল সেখানকার চিকিৎসকদের বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মিল ঘটানো। এখানেও তিনি রোগী হাতে-কলমে পরীক্ষা করে ছাত্রদের পড়ানোর ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় বয়সের ভার থাকা সত্বেও সামরিক পোশাক পরে কানাডা ও মার্কিন বাহিনীর হাসপাতালে চলে এলেন সেবা করতে। বেসরকারী ভাবে তাঁকে সবাই বলতো, 'সৈন্যবাহিনীর সান্ত্বনা দাতা সেনাপতি। শত শত আহত-সৈন্যদের আত্মীয়ের চিঠি পেতেন এবং প্রত্যেককেই উত্তর দেওয়া হতো, 'আপনার ছেলেকে ডাঃ অসলার দেখছেন, সে ভাল আছে।'

১৯১৭ সালে ইয়োপ্রেসে অকলারের একমাত্র সন্তান ২১ বছরের রিভিয়ার অসলার গুরুতর ভাবে আহত হন। শত চেষ্টা করেও ডাক্তাররা তাকে বাঁচাতে পারেন নি।

যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হবার পর স্যার উইলিয়াম অকলার বেলজিয়ামের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত লাইব্রেরী আর অষ্ট্রিয়ার উপবাসী শিশুদের জন্যে অর্থ-সংগ্রহে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পুত্র শোকাতুর পিতা ভেতর থেকে এতো দুর্বল হয়ে যান যে ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে নিউমোনিয়া হয়ে মারা গেলেন। তিনি নিজেই বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে মৃত্যু আসন্ন. তাই মারা যাবার পর পাশের টেবিলে একটা কাগজ পাওয়া গিয়েছিল তাতে লেখা ছিল : 'চমৎকার যাত্রার পর বন্দরের কাছে প্রথম পৌঁছে গেছি, সঙ্গে ছিল অসাধারণ যাত্রীরা, এবং বন্দরে অপেক্ষা করছে আমার ছেলে।' □ □

বিজ্ঞানের ভেলকি•

রসায়নে অনুঘটক নিশ্চয়ই পড়েছ। অনুঘটকের কাজ হল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নিজে অংশগ্রহন না করে শুধু উপস্থিত থেকে কোন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সফল করা। এক খন্ড চিনির ঘনক, সিগারেটের ছাই এবং দেশলাই নিয়ে পরীক্ষাটি ঘরে বসে সহজেই করতে পারো।

প্লেটের উপর এক খন্ড চিনির ঘনক রেখে দেশলাই জ্বালিয়ে আগুন লাগাবার চেষ্টা করো। দেখবে কিছুতেই আগুন জ্বলছে না। এবার ঘনকের একধারে ছাই মাখিয়ে আগুন জ্বালাও দেখবে এখন সহজেই আগুন লেগে জ্বলতে থাকবে।

এখানে ছাই অনুঘটকের কাজ করছে। ছাইয়ের উপস্থিতির কারনেই চিনি জ্বলেছে। ছাই নিজে দাহ্য নয় এবং নিজে অপরিবর্তিত থাকছে জ্বলার সময়।

Kisore Vismoi Jan '85 Regd. No. WB/EC—263 Rs. 3·00 only